2133.

সাবিত্রীতত্ত্ব।

11776

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

MAHARAJAH'S LIBRARY
20 NOV 1900
COOCH BEHAR.

কলিকাতা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রকাশিত।
সন ১৩০৭ সাল।

মূল্য কাপড়ে বাঁধাই এক টাকা চারি আনা মাত্র,
কাগজে বাঁধাই এক টাকা মাত্র।

Calcutta:
PRINTED BY R. DUTT,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
1900.

বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের শ্লোকের বঙ্গানুবাদ বৰ্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে প্রচারিত অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। গুটিকতক শ্লোকের পদ্যানুবাদ দিয়াছি। উহা শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর প্রণীত 'সাবিত্রী চরিত' হইতে লইয়াছি। 'সাবিত্রী চরিত' পড়িতে পড়িতেই আমার সাবিত্রীতত্ত্ব লিখিবার বাসনা হইয়াছিল। জ্ঞান বাবুর নিকট আমি ঋণী। পঠদ্দশায় তিনি আমার ছাত্র ছিলেন। আমার বড় শ্লাঘার কথা, রাজকার্য্যে এত ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি সুসাহিত্যের আলোচনা ও সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। ইতি

কলিকাতা।
১৪ই জ্যৈষ্ঠ সন ১৩০৭ সাল।
ইং ২৭ এ মে ১৯০০ সাল।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

উৎসর্গ

'সাবিত্রীতত্ত্ব'

আমার

সহধর্ম্মিণীর হস্তে

অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা।
৫ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।
১৪ই জ্যৈষ্ঠ সন ১৩০৭ সাল।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সূচী।

MAHARAJAH'S LIBRARY
20 NOV 1900
COOCH BEHAR

সাবিত্রীতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

সাবিত্রীর জন্ম।

পুরাণে অনেক নরনারীর আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় জীবনী বা জীবনচরিত যে প্রণালীতে লিখিত হয়, ঐ সকল আখ্যায়িকা সে প্রণালীতে লিখিত নহে। পুরাণের আখ্যায়িকা এবং ইউরোপের জীবনচরিতের মধ্যে যে সকল প্রভেদ লক্ষিত হয়, এস্থলে তাহার

বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। এস্থলে একটী কি দুইটী প্রভেদের উল্লেখ করিতে হইবে। সে প্রভেদ কিছু গুরুতর। সে প্রভেদের অর্থও কিছু গুরুতর। পুরাণের আখ্যায়িকা এবং ইউরোপের জীবনচরিত, দুইয়েতেই জন্ম কথা থাকে। কিন্তু সে কথা দুইয়েতে একই প্রকার নহে। ইউরোপের জীবনচরিতে জন্মের স্থান, বর্ষ, বার প্রভৃতি থাকে। জন্ম সম্বন্ধে ঐ গুলি অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়। অনেক জীবন-চরিতে ঐ সকল লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ, দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র গোল থাকিলে আর রক্ষা নাই। অনু-সন্ধান আর শেষ হয় না; লেখাও আর ফুরায় না। পুরাণের আখ্যায়িকার জন্মকথায় এ সব নাই। পুরাণ সন তারিখের দিকে যায় না বলিয়াই যে নাই, তাহা নহে। সন তারিখে বিশেষ কিছু আছে বলিয়া পুরাণকারদিগের জ্ঞান থাকিলে, অন্ততঃ জন্ম কথায় সে সংবাদ থাকিত। পুরাণের লিখিত জন্ম বিবরণে অন্যরূপ সংবাদ প্রদত্ত হয়। নবজাত শিশু সুলক্ষণাক্রান্ত কি কুলক্ষণাক্রান্ত, জন্মকালে শুভচিহ্ন দৃষ্ট হয় কি অশুভ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এই প্রকার অনেক

কথা উহাতে থাকে। দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইল। ব্যাস বলিলেন ঃ—

সজাত মাত্র এবাত ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপ।
রাসভারাবসদৃশং রুরাবচ ননাদ চ॥
তং খরাঃ প্রত্যভাষন্ত গৃধ্রগোমায়ুবায়সাঃ।
বাতাশ্চ প্রববুশ্চাপি দিগ্‌দাহশ্চাভবত্তদা॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১৫ অধ্যায়।

হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে লাগিল; প্রচণ্ড বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, এবং দিগ্‌দাহ হইতে লাগিল।

সাবিত্রীর জন্ম হইল। ব্যাস বলিলেন—তিনি 'রাজীবলোচনাম্' অর্থাৎ কমললোচনা। কমললোচন স্ত্রীজাতির বড় সুলক্ষণ। জন্মের বিবরণে ইউরোপীয় জীবনচরিতে এরূপ সুলক্ষণ কুলক্ষণ শুভ চিহ্ন অশুভ চিহ্ন প্রভৃতির কথা থাকে না। যাহার জন্ম হইল সে পরে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, ধার্ম্মিক হইবে কি অধার্ম্মিক হইবে, তাহার জন্মকালে ইউরোপী-য়েরা তাহা নির্ণয় করেন না, নির্ণয় করিবার চেষ্টাও

করেন না, বোধ হয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা বাতুলতা মনে করেন। জন্মমুহূর্ত্তে মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতির অন্বেষণ করা হিন্দুর রীতি, ইউরোপীয়ের নহে। দুইজনের রীতির এই বিভিন্নতার একাধিক হেতু আছে। এস্থানে সে সমস্ত হেতুর আলোচনা করা যাইতে পারে না। সে আলোচনার স্থান ইহা নহে। এখানে কেবল দুইটী হেতুর উল্লেখ করিব। হিন্দুর কর্ম্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ আছে। কর্ম্মফলে যে স্বভাবপ্রকৃতি অবশ্যম্ভাবী, জন্মকালেই দেহে তাহার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে পারে। ইউরোপের কর্ম্মফলবাদও নাই, জন্মান্তরবাদও নাই। ইউরোপীয়দিগের প্রথম দৃষ্টি শরীরের উপর, হিন্দুর প্রথম দৃষ্টি স্বভাব প্রকৃতির উপর। নবজাত শিশু দুর্ব্বল বা রুগ্ন হইলে, ইউরোপের জীবনচরিতে সেই কথাই কিছু বিশেষ করিয়া লিখিত হয়।

পুরাণকারের জন্মকাহিনীতে আর এক প্রকার কথা থাকে। সে প্রকার কথা বোধ হয় আর কাহারো জন্মকাহিনীতে থাকে না। সেকথা জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে। সাবিত্রীর জন্ম কথা প্রসঙ্গে ব্যাস বলিতেছেন :—

আসীন্মদ্রেষু ধর্ম্মাত্মা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পার্থিবোঽশ্বপতির্নাম সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাগ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্॥
অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
হুত্বা শত সহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ।
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ॥

অর্থাৎ

মদ্র দেশে ছিল রাজা ধার্ম্মিক প্রধান,
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যব্রত, দক্ষ, ক্ষমাবান।
অশ্বপতি নাম তাঁর পৃথিবীর পতি,
সকল প্রাণীর হিতে রত মহামতি।
যাগযজ্ঞপরায়ণ, দাতা, জিতেন্দ্রিয়,
পুরবাসী, গ্রামবাসী সকলের প্রিয়।
যৌবন অতীত কিন্তু না হয় সন্তান,
অপুত্র বলিয়া রাজা সদা খিদ্যমান।
রাজা হৈলা ব্রহ্মচারী পুত্রের কারণ,
করেন কঠোর সব নিয়ম পালন।
আপন ইন্দ্রিয়গণ করিয়া দমন,
যথাকালে স্বল্লাহার করেন গ্রহণ।

বেদোক্ত সাবিত্রী-মন্ত্র করি উচ্চারণ,
লক্ষাহুতি হুতাশনে করেন অর্পণ।
এইরূপে নরপতি আঠার বৎসর,
পালিলা একান্তভাবে ব্রত নিরন্তর।

সন্তান লাভার্থ যাগযজ্ঞ ব্রত ব্রহ্মচর্য্য সংযম শুদ্ধাচার মিতাহারাদির কথা কেবল যে সাবিত্রীর উপাখ্যানে লিখিত হইয়াছে তাহা নহে, পুরাণের বহু উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়। সন্তানোৎপত্তির প্রশস্ত কালের মধ্যে সন্তান না হইলে, তখনকার রাজারা যাগযজ্ঞ ব্রত ব্রহ্মচর্য্যাদি করিতেন এবং কথিত আছে যে তাহার ফলস্বরূপ সন্তান লাভ করিতেন। দশরথের পুত্রেষ্টি যাগের কথা সকলেই জানেন। কেবল যে রাজারাই সন্তান কামনায় এরূপ যাগ যজ্ঞাদি করিতেন তাহা নহে, সকল শ্রেণীর লোকেই করিত। এখনও অনেকে করে। এখনও অনেকে ব্রত-রূপে কার্ত্তিক পূজা করে এবং বহুদিন ধরিয়া পুরাণ-কথা শ্রবণ করে ও তদুপলক্ষে নানা লোকহিতকর কার্য্য করিয়া থাকে। বোধ হয় সন্তানলাভের জন্য এরূপ অনুষ্ঠান হিন্দু ভিন্ন আর কেহই করে না। এরূপ করিলে সন্তান লাভ হইতে পারে, বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন আর কাহারও এ বিশ্বাসও নাই। এ বিশ্বাস সমূলক

কি অমূলক, তাহার বিচার বা মীমাংসা বড় সহজ নহে—এ স্থানে তত প্রয়োজনীয়ও নহে। এই সকল অনুষ্ঠান করিলে দেবতারা যথার্থ ই তুষ্ট হইয়া সন্তান দেন কি না, এস্থলে সে কথার আলোচনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সন্তানলাভার্থ ঐরূপ অনুষ্ঠান করেন, দেবতারা তুষ্ট হইলে সন্তান দিয়া থাকেন, এ বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বড় দৃঢ়, বড় গভীর। সাধারণ উপায়ে যাহা হয় না, এইরূপ বিশ্বাসের গভীরতায় তাহা হওয়া অসম্ভব নয়। শুদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে বা শরীরের ধর্ম্মে যাহা অসাধ্য, মানসিক সামর্থ্যে এবং ধর্ম্মবলে—চিত্তের একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সাত্ত্বিকতা প্রভৃতির ফলে—তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব, অনেক স্থলে সাধিত হইয়া থাকে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং ব্রতাদি পালন যেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, একাগ্রতা এবং সাত্ত্বিকতা ব্যতীত অসম্ভব, ঐ গুণগুলির তেমনি পরিবর্দ্ধক এবং তীব্রতাসাধক।

আঠার বৎসর কঠোর নিয়মাদি পালন করা হইলে পর, সাবিত্রী দেবী অশ্বপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া, যাহাতে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তাঁহাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন ঃ—

এতেন নিয়মেনাসীদ্বর্ষাণাষ্টাদশৈব তু।
পূর্ণে ত্বষ্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ ॥
রূপিণী তু তদা রাজন্ দর্শয়ামাস তং নৃপম্।
অগ্নিহোত্রাৎ সমুত্থায় হর্ষেণ মহতান্বিতা ॥
উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ।
সর্ব্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব ॥
বরং বৃণীষ্বাশ্বপতে মদ্ররাজ যদীপ্সিতম্।
ন প্রমাদশ্চ ধর্ম্মেষু কর্ত্তব্যস্তে কথঞ্চন ॥

অশ্বপতিরুবাচ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়ামযা।
পুত্রা মে বহবো দেবি ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥
তুষ্টাসি যদি মে দেবি বরমেতং বৃণোম্যহম্।
সন্তানঃ পরমো ধর্ম্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

পূর্ব্বমেব ময়া রাজন্নভিপ্রায়মিমং তব।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ ॥
প্রসাদাচ্চৈব তস্মাত্তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ভুবি।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্যা ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥
উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।
পিতামহনিসর্গেণ তুষ্টা হ্যেতদ্ব্রবীমি তে ॥

অর্থাৎ

আঠার বৎসর যবে হইল অতীত।
সাবিত্রী রাজার প্রতি হইলেন প্রীত॥
বরদারূপিণী দেবী আনন্দে তখন,
হোমাগ্নি হইতে উঠি দিলা দরশন।
আবির্ভূতা হইলেন রাজার সদন।
সম্ভাষিয়া কহিলেন মধুর বচন॥
শুদ্ধাচারে, ব্রহ্মচর্য্যে, নিয়ম পালনে,
একান্ত ভক্তিতে আর ইন্দ্রিয় দমনে,
প্রীত হইয়াছি রাজা! আমি অতিশয়,
প্রার্থনা করহ বর যাহা ইচ্ছা হয়।
আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে সদা দিও মন,
করিও অটলভাবে ধর্ম্মের সাধন।
অশ্বপতি কহিলেন পুত্রের কারণ,
ধর্ম্মকামনায় ব্রত করেছি পালন।
বহু পুত্র হোক মম দাও দেবি! বর,
আর যেন হয় তারা সবে বংশধর।
মম প্রতি হয়ে থাক যদ্যপি সদয়,
এই বর দাও, ইহা মনোমত হয়।
ব্রাহ্মণের মুখে আমি শুনেছি বচন,
সন্তানই একমাত্র ধর্ম্মের সাধন।
বলেন সাবিত্রী দেবী রাজারে তখন,
পূর্ব্ব হতে মনোরথ জানিয়া রাজন!

সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মার সদন
তব পুত্র-কথা আমি করেছি জ্ঞাপন।
তেজস্বিনী কন্যা তব অচিরে রাজন!
ব্রহ্মার প্রসাদে জন্ম করিবে গ্রহণ,
উত্তর দিবার নাহি ইহাতে তোমার,
তুষ্ট হইয়াছি তব দেখি ব্যবহার।
এই সব কথা আমি ব্রহ্মার আজ্ঞায়
অতিশয় প্রীত হয়ে কহিনু তোমায়।

ইহাতে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার গুটিকতক কথা আছে। একটী কথা এই—অশ্বপতি শুনিয়াছিলেন যে 'সন্তানই একমাত্র ধর্ম্মের সাধন' এবং সেই জন্য তিনি 'পুত্রের কারণ ধর্ম্মকামনায় ব্রত পালন' করিয়াছিলেন—অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়া ময়া। ইহার অর্থ এই যে,সন্তানের প্রয়োজন ধর্ম্ম সাধনার্থ; অতএব সন্তানকামনায় ব্রতপালন, ধর্ম্মার্থ ব্রত পালন হইতে ভিন্ন নহে। আর একটী কথা এই—বংশধর হইবে, অর্থাৎ, বংশ রক্ষা করিতে পারিবে, অশ্বপতি সাবিত্রীদেবীর নিকট এইরূপ সন্তানের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রাচীন কালে অনেকেই এইরূপ সন্তানের কামনা করিতেন। তাঁহারা সুপুত্রকেই বংশধর বলিতেন, কুপুত্রকে

কুলনাশক জ্ঞান করিয়া পুত্র বলিয়া গণ্যই করিতেন না। ব্যাধিশূন্য, সুস্থ, বলিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক সন্তানই বংশধর হইতে পারে, বংশ রক্ষা করিতে পারে। ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বল বা অধার্ম্মিক সন্তান বংশনাশের প্রত্যক্ষ বা পরম্পরা সম্বন্ধে হেতু হইয়া থাকে। অশ্বপতি প্রকৃত বংশধর, অর্থাৎ, ব্যাধিশূন্য বলিষ্ঠ ধার্ম্মিক সন্তান কামনা করিয়াছিলেন। আরও একটী কথা এই—প্রকৃত বংশধর কামনা করিয়া অশ্বপতি যে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন, স্থূল দৃষ্টিতে তাহার দুইটী অংশ বা অঙ্গ লক্ষিত হয়। এক অংশ দেবার্চ্চনা ও দেবভক্তি—হুত্বা শত সহস্রং স সাবিত্র্যা—অশ্বপতি সাবিত্রীমন্ত্রে প্রতিদিন লক্ষবার আহুতি প্রদান করিতেন। সাবিত্রী দেবী সেই জন্যই অশ্বপতিকে বলিয়াছিলেন—সর্ব্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি—তোমার সম্পূর্ণ যত্ন ও ভক্তিতে আমি তোমার উপর পরিতুষ্ট হইয়াছি। আর এক অংশ দেহশুদ্ধি—ব্রহ্মচর্য্য, নিয়মিতাহার, ইন্দ্রিয়দমনাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি। অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ—অর্থাৎ, অশ্বপতি অপত্য উৎপাদনার্থ যথাকালে নিয়মিতাহারী, ব্রহ্মচারী

ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুস্থকায় বলিষ্ঠ দীর্ঘজীবী সন্তান উৎপাদন করিতে হইলে, আহারে বিহারে সংযমী হইতে হয়। অনেক অসংযমীর সন্তান একেবারেই হয় না ; অনেক অসংযমীর সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল ও স্বল্পজীবী হইয়া থাকে। কারণ বুঝা কঠিন নহে। যেখানে অসংযম এবং অমিতাচার, সেখানে বীজ এবং ক্ষেত্র দুইই নিস্তেজ এবং বিকৃত হয়, সুতরাং ফলের অভাব হয় : অথবা ফল অপক্ক ও অস্থায়ী হইয়া থাকে। আমার স্বর্গীয় আচার্য্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটী গল্প বলিঃ—

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভিরাম গোস্বামী নামে একজন যোঢ়াসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। যোঢ়াসিদ্ধেরা এক প্রকার দেবাধিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁহারা যাহাদিগকে প্রণাম করেন, যদি তাহাদিগের শরীরে দৈবশক্তির আবির্ভাব না থাকে, তাহা হইলে প্রণাম করিবা মাত্র তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সন্তান জন্মিলে, অভিরাম একদা গুরুদর্শনে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, 'অভিরাম! আমার পুত্র হইয়াছে'। অভিরাম ঠাকুর পুত্র দর্শনে গমন

করিলেন এবং সূতিকাগারের দ্বার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে প্রণাম করিলেন। শিশুটী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপ তিন চারিবার হইলে মহাপ্রভু তিন বর্ষের নিমিত্ত স্ত্রী সহবাস পরিহার পূর্ব্বক অনেকগুলি যোগের অনুষ্ঠান করিলেন। আবার অভিরাম আসিলেন—আবার ঠাকুরপুত্রকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু এবার শিশুটীর কোন হানি হইল না। প্রত্যুত শিশুটী পদোত্তোলন পূর্ব্বক যেন পিতৃশিষ্যকে আশীর্ব্বাদ প্রদানের ইঙ্গিত করিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ঐ সন্তানটীই পরে বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হইয়া সমস্ত বঙ্গভূমিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাবল্য সংস্থাপন করেন"। *

আমার আচার্য্যদেব লিখিয়াছেন—'এই গল্পে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে'। তাহার পরই বলিয়াছেন ঃ—

"আমার কোন কোন আত্মীয়ার পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইতেছে শুনিয়া আমি তাঁহাদিগের স্বামীদিগকে পরামর্শ দিয়াছি যেন পুনর্গর্ভ ধারণের কাল বিলম্বিত হয়। কাল বিলম্বে গর্ভস্রাব দোষ সারিয়া

* পারিবারিক প্রবন্ধ নামক পুস্তকে সন্তান পালন শীর্ষক প্রবন্ধ।

গিয়াছে। আমার বোধ হয়, যদি একটী সন্তান জন্মিবার ৪।৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ না হয় তবে প্রসূতীর শরীর ক্ষয় হয় না, এবং সূতিকা গৃহেও এত অধিক সন্তানের অকালমৃত্যু সংঘটন হয় না।"

সংযম মিতাচারাদি সন্তান রক্ষার নিমিত্তও যেমন আবশ্যক, সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত ও তেমনি আবশ্যক। আমাদের দেশের লোকের এইরূপ ধারণা যে, যাহারা বেশ্যাসক্ত বা পরদারগামী, অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় সেবায় অমিতাচারী, তাহাদের বংশ রক্ষা হয় না। এরূপ ধারণা ভূয়োদর্শন হইতে জন্মিয়া থাকে। ভূয়োদর্শনে, বোধ হয়, লোকের এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ব্যভিচারাসক্ত লোকে হয় সন্তান উৎপাদন করিতে অসমর্থ হয়, নয় রুগ্ন বা দুর্ব্বল সন্তান উৎপাদন করিয়া শীঘ্র বংশ নাশ করিয়া ফেলে। এরূপও দেখা যায় যে, ধনীর ঘরে সন্তান কম হয়। অনেক রাজা, জমিদার ও ধনবানের বংশ পোষ্য পুত্র দ্বারা রক্ষিত হয়। রাজারাজড়ার ঘরে বিলাস বড় প্রবল। বিলাসে শোণিতাদি শরীরের সমস্ত উপকরণ বিকৃত হইয়া যায়। সন্তান উৎপাদন পক্ষে শরীরের

যে ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক, বিলাসে তাহা হইতে পারে না অথবা বিনষ্ট হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালের অনেক রাজা এই কারণে যৌবনে সন্তান উৎপাদন করিতে না পারিয়া, সন্তানোৎপাদন করিবার শক্তি লাভ করিবার জন্য শেষে ব্রতাদি গ্রহণপূর্ব্বক সংযম, মিতাচারাদি অভ্যাস করিয়া শরীরের শুদ্ধি সাধন করিতেন ও মনের সামর্থ্য সঞ্চয় করিতেন। কিন্তু সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি সে শ্রেণীর রাজা ছিলেন না। তিনি প্রথম হইতেই—

————————ধর্ম্মাত্মা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
————————সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥

অর্থাৎ

পরমধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা, দ্যুতিমান্, ব্রহ্মপরায়ণ, মহাত্মা, সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, যাগশীল, বদান্যগণের অগ্রগণ্য, দক্ষ, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র, সর্ব্ব ভূতের হিতকার্য্যে নিরত।

সুতরাং তাঁহাকেও যে বিশেষভাবে ব্রতাবলম্বী হইয়া আহার বিহারাদিতে কঠোর নিয়ম পালন

করিতে হইয়াছিল, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বোধ হয়, ইহার গূঢ় অর্থ বুঝবার নিমিত্ত, অশ্বপতির ব্রতের অপর অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। সে অঙ্গ দেবার্চ্চনা, দেবভক্তি ইত্যাদি। এ সকল কার্য্য আহারবিহারাদিতে সংযম ব্যতীত সম্পূর্ণ ও সুচারুরূপে করা যায় না। আমাদের শাস্ত্রানুসারে আহার করিয়া পূজা করা যায় না। দেবদেবীর নিকট পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইলে, বালককেও অনাহারে থাকিতে হয়। একটা বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতে হইলেও, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন সংযম করিতে হয়। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া বর বিবাহ করিতে পারে না; বিবাহ সম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে উপবাসী থাকিতে হয়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের এইরূপ ব্যবস্থা। বোধ হয়, ধর্ম্মসাধন এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি মানুষের সূক্ষ্মতর ও উচ্চতর শক্তির সঞ্চালন পক্ষে ইহাই ঠিক ব্যবস্থা। যে কার্য্যই বল, পূর্ণ প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ, অসীম ভক্তি আগ্রহ ও অনুরাগ সহকারে করা হইলে, কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আহারে প্রবৃত্তিই হয় না, শরীরের প্রতি দৃষ্টিই থাকে না। বাল্যকালে বাটীর দুর্গোৎসবে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে অসীম উল্লাস ও

উৎসাহ হইত। নবমী পূজার দিন দক্ষিণান্ত হইতে বেলার অবসান হইয়া পড়িত ; তাহার পর পুষ্পাঞ্জলি দিতাম। অনশন জন্য শরীরের অবসন্নতা হওয়া দূরে থাকুক, পুষ্পাঞ্জলি দিবার পর দেহে দ্বিগুণ বল, মনে অসীম স্ফূর্ত্তি অনুভূত হইত। পিতামাতার আদ্যকৃত্যের দিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অনশনে যতই কার্য্য করা যায়, বল উৎসাহ ও উল্লাস ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে কার্য্যে সমস্ত মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করা যায়, সে কার্য্য মানুষকে দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর দেয় না, দেহের অভাবাদি যেন একেবারে বিদূরিত করিয়া ফেলে এবং সেই জন্য দেহের স্বাস্থ্য ও বলহানির হেতু হয় না। ফলতঃ সেই কার্য্যটীই মানুষের আহার স্বরূপ হইয়া থাকে, উহার সম্পাদনেই দেহের বল সংরক্ষিত হয়। আহার তত্ত্বের ইহা বড়ই গূঢ়, বড় উচ্চ কথা। এ কথা শারীর বিজ্ঞানে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না ; বোধ হয় সে বিজ্ঞানে ইহার বিপরীত ভাবেরই কথা আছে। এ কথা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের একটী প্রধান কথা—ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বপ্রধান

কথা। এ কথা একদিন ইউরোপে বেশই ছিল; এখন কম হইয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া আমরা এ কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু ইংরাজী শিখিয়াছি বলিয়া আমাদেরই ঐ কথা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কারণ অন্যে জানুন আর নাই জানুন, আমরা বেশই জানি যে ইউরোপের বড় বড় লেখকেরা প্রাতঃকালে ও গভীর রাত্রেই অধিক লিখিয়া পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ দিবারাত্রির মধ্যে পাকস্থলী যে সময় খালি থাকে, ভুক্তদ্রব্যের ভারে আক্রান্ত না থাকে, বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিবার, চিন্তাশক্তি উন্মেষিত হইবার, অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা করিবার, আধ্যাত্মিক শক্তি সাধন করিবার, কল্পনা-কজ্জলে দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হইবার তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়। পাকস্থলীর ভারাক্রান্তাবস্থা ঐ সকল উচ্চাঙ্গের কার্য্যের বিষম বিরোধী ও বিঘ্নকর। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের এ কথার সত্যতা ও সারবত্তার প্রমাণ আমাদের যেরূপ আছে, বোধ হয় অপর কাহারও সেরূপ নাই। বহু প্রাচীন কাল হইতে আহার বিহারাদি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা যত কঠোর নিয়ম পালন

করিয়াছেন, অন্য কোন বর্ণের হিন্দু তত করেন নাই। এখনও অনশন, একাহার, স্বল্পাহার প্রভৃতি ব্রাহ্মণের মধ্যে যত প্রচলিত, অন্য কোন বর্ণের মধ্যে তত নাই। অথচ সর্ব্ব প্রকার বলের সমষ্টিরূপে—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সকল শক্তির আধার রূপে—অপর কোন হিন্দুই ব্রাহ্মণের সমান নহে। কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আহার বিহারাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন, এক দিকে যেমন অপরিহার্য্য, অন্যদিকে শরীর ও মন দুইয়েরই তেমনি শক্তিবর্দ্ধক। অশ্বপতি সন্তানকে 'ধর্ম্মসাধন' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; এবং সেই জন্য সন্তান লাভার্থ বিশেষভাবে বিশেষ ব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি যেমন-তেমন সন্তানের অভিলাষী হয়েন নাই। তাঁহার বংশ রক্ষা করিতে পারিবে, এমন শক্তিসম্পন্ন সন্তানের অভিলাষী হইয়াছিলেন। এইরূপ সন্তানই 'ধর্ম্মসাধন', এই বিশেষ জ্ঞানে তাঁহাকে বিশেষভাবে বিশেষ ব্রতাবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় এইরূপ জ্ঞানে এই ভাবে এরূপ ব্রত পালন করিলে তবে লোকে সাবিত্রীর ন্যায় তেজস্বিনী ধর্ম্মরূপিণী সর্ব্ব-

লোকপূজ্যা সন্তান উৎপাদন করিবার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক যোগ্যতা বা প্রকৃতি লাভ করে। বোধ হয় জীবের মতন জীব সৃষ্টি করিবার শক্তি, এইরূপ করিলে তবে উদ্ভূত হয়, নহিলে হয় না। অশ্বপতির ব্রতপালনে প্রসন্ন হইয়া সাবিত্রী দেবী যখন তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মার নাম করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

পূর্ব্বমেব ময়া রাজন্নভিপ্রায়মিমং তব।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ॥
প্রসাদাচ্চৈব তস্মাত্তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ভুবি।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥
উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।
পিতামহ নিসর্গেণ তুষ্টা হ্যেতদ্ব্রবীমি তে॥

অর্থাৎ

হে রাজন! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান ব্রহ্মাকে তোমার পুত্রের নিমিত্ত বলিয়াছিলাম। হে সৌম্য! স্বয়ম্ভু বিহিত সেই প্রসাদ হইতে পৃথিবীতে শীঘ্রই তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা হইবে। আমি পিতামহের আজ্ঞাক্রমে

তুষ্টা হইয়া তোমারে এই কথা বলিতেছি, অতএব তুমি কোন ক্রমে ইহাতে কোন উত্তর করিও না।

সৃষ্টিকার্য্য—ব্রহ্মার। সাবিত্রী—দেবী, মহা-শক্তিরূপিণী। অশ্বপতির দেবভক্তি ও সংযমাদিতে 'তুষ্টা' হইয়া শক্তিরূপিণী বলিলেন, আমি পিতামহের অর্থাৎ ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে তোমাকে বলিতেছি যে, তাঁহার প্রসাদে তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা হইবে। এ কথার অর্থ এই যে, সন্তানোৎপাদন কার্য্য পরমধর্ম্ম সাধন, এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার্চ্চনা এবং সংযমাদি কঠোর শারীরিক নিয়ম পালন করিলে, মনুষ্যের যে শক্তি হইতে সন্তানের সৃষ্টি হয় তাহা সাবিত্রীর ন্যায় সন্তান সৃষ্টির অনুকূল হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না। রামচন্দ্রের ন্যায় ধার্ম্মিক এবং বল-বীর্য্যশালী সন্তান লাভ করিবার জন্য রাজা দশরথকেও অশ্বপতির ন্যায় কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া বড় বড় যাগ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। পুরাণে এরূপ আরো অনেক আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে সন্তানোৎপাদন বড় গুরুতর কার্য্য—যে সন্তান বংশরক্ষা করিবে, বংশ উজ্জ্বল করিবে—সে সন্তানের উৎপাদন কার্য্য

পরমধর্ম্ম সাধন—অতএব সে কার্য্য সম্পাদনে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় শক্তি সম্মিলিত ভাবে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। পিতৃ মাতৃ প্রকৃতিতে যাহা যে ভাবে থাকে, সাধারণতঃ তাহা সেই ভাবে সন্তানে সঞ্চারিত হয়। পিতৃ মাতৃ প্রকৃতিতে যাহার প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য, সন্তানেও তাহার প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য হওয়া সম্ভব। ধর্ম্মসাধন জ্ঞানে ধর্ম্মচর্য্যার প্রণালীতে চিত্তের সহিত দেহ সম্মিলিত করিয়া সন্তানোৎপাদন কর, ধার্ম্মিক এবং বলবীর্য্যশালী সন্তান লাভ করিবে—প্রকৃত বংশধর প্রাপ্ত হইবে। সাবিত্রীর ন্যায় সন্তান পাইবার জন্য, সাবিত্রীর জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতাকে কি করিতে হইয়াছিল, এই তথ্য বুঝাইবার নিমিত্ত সাবিত্রীর জন্মবৃত্তান্তে বেদব্যাস তাহা বলিয়া দিয়াছেন। পুরাণকার ভিন্ন অপর কাহারো লিখিত জীবনচরিতে জন্মের বিবরণে এরূপ কথা থাকে না। না থাকিবার কারণ আছে। ধর্ম্মসাধন জ্ঞানে সন্তানোৎপাদন কার্য্য সম্পন্ন করিলে তবে সন্তান ধার্ম্মিক ও বলবীর্য্যশালী হয়, বোধ হয় এ তথ্য হিন্দু শাস্ত্রকার ভিন্ন অপর সকলের অবিদিত এবং বিদিত হইলেও কার্য্যতঃ অনুসৃত নহে। সন্তানোৎপাদন

কার্য্যে ইউরোপে শরীর এবং চিত্ত সম্মিলিত হয় কি না, ঠিক জানি না, বোধ হয় কেবল শারীরিক শক্তিই নিয়োজিত হয়। শারীরিক শক্তিও আবার সুসংস্কৃত ভাবে নিয়োজিত হয় না। কারণ শরীরের সংস্কারসাধক যে চিত্ত, তাহা শরীর হইতে তথায় পৃথগীকৃত থাকে। ইহার ফল এই হইতেছে যে, ইউরোপে শারীরিক বলসম্পন্নের বা ষণ্ডাগুণ্ডার সংখ্যা বাড়িতেছে, ধর্ম্মভীরু ধর্ম্মপরায়ণ লোকের সংখ্যা কমিতেছে। সন্তান জন্মিলে পর তাহাকে ধর্ম্মশীল করিবার নিমিত্ত ইউরোপে অনেকে এখনও অনেক চেষ্টা বা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাহার শতাংশ চেষ্টা বা অনুষ্ঠান আমরা একালে করি না। কিন্তু যে সন্তান জন্মিবে, জন্মিয়া সে যাহাতে কেবল শারীরিক বলে বলীয়ান না হইয়া, ধর্ম্মবলেও বলীয়ান হয়, ইউরোপে সে পক্ষে কোন অনুষ্ঠান করা হয় বলিয়া বোধ হয় না। সে পক্ষে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠান করিলে ইউরোপের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। ইউরোপে ধার্ম্মিকের সংখ্যা ত বাড়িবেই, শারীরিক স্বাস্থ্যও পরিষ্কৃতি এবং উন্নতি লাভ করিবে। অনেকে মনে করেন যে,

ইউরোপীয়েরা শারীরিক উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতার্থে তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই গোঁয়ার; তাহারা সামান্য কারণে প্রলয় কাণ্ড ঘটায়; তাহারা রাগ প্রভৃতি রিপু দমনে অসমর্থ। যাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য প্রকৃতার্থে উৎকৃষ্ট, তাহাদের এ সকল দোষ থাকে না। যাহাদের চিত্তের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট, কেবল তাহাদেরই শারীরিক স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট হইতে পারে। আমার স্বর্গীয় আচার্য্য মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, 'আপনারা সুস্থ শরীর ধর্ম্মশীল না হইলে সন্তানও সুস্থ শরীর হইবেনা'।* শরীরের স্বাস্থ্যসাধন ধর্ম্মসাধনের অন্তর্গত। দুঃখের বিষয়, হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন শাস্ত্রে এ কথা বলে না; বলিলে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল হইত। এখন প্রায় সকলেই যে ইউরোপের অধীন বা মুখাপেক্ষী।

এইবার এক্ষণকার, অর্থাৎ, নব্য বাঙ্গালীর কথা বলিব। বলা বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। সাবিত্রীর কথা আমাদেরই পুরাণের কথা, আমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা, আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষদিগের কথা। এরূপ কথায় আমাদিগের পুরাণাদি

* পারিবারিক প্রবন্ধে সন্তান পালন নামক প্রবন্ধ।

পরিপূর্ণ। কিন্তু এরূপ কথা আমরাই অধিক অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করি, অমান্য করা পরম পৌরুষ মনে করি। আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, মিতাচার প্রভৃতি যত কম, বোধ হয় অপর কাহারো তত কম নহে। আমরা অসংযম অমিতাচার অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া পড়িয়াছি। সন্তানোৎপাদনকে ধর্ম্মসাধন মনে করিতে আমাদেরই যে লজ্জা, ঘৃণা ও ক্রোধের সীমা থাকেনা। আর এই জন্য আমরা—আজিকার দিনের বাঙ্গালী স্ত্রী ও পুরুষ—শারীরিক ও মানসিক বলে পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যে সকল সন্তান উৎপাদন করিতেছি তাহাদিগকে দেখিয়া সমস্ত ইউরোপ মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। একে বঙ্গের জল বায়ু ভাল নয়, তাহার পর অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যাপক মেলেরিয়া ব্যাধি, তাহার পর আবার আহার বিহারাদিতে সংযমাদির ঐকান্তিক অভাব। এই অবস্থায় ধর্ম্মশাসন, সামাজিক শাসন, পারিবারিক শাসন—সমস্ত শাসন অমান্য করিয়া, উপেক্ষা করিয়া, উড়াইয়া দিয়া আমরা যে সন্তানের সৃষ্টি করিতেছি, তাহারা কেমন করিয়া

সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হইবে? তাহাদিগকে কীট পতঙ্গের ন্যায় অধম বলিলে কেনই বা অপরাধ হইবে? ইহার প্রতিকার আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,আমাদের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীর পরিবর্ত্তে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে,বাঙ্গালী শারীরিক বলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। আমাদের বিশ্বাস তাহা নহে। যাহারা অসংযমী, তাহাদের বিবাহ যত বয়সেই হউক, তাহাদের সন্তান সুস্থকায় ও বলশালী হইতে পারে না। কিন্তু ধরা যাউক,এক্ষণকার বিবাহপ্রণালী উঠিয়া গেলে বাঙ্গালী বলিষ্ঠ হইবে। বলিষ্ঠ হইবে, হয় ত কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমানও হইবে; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত নহে কি? ধর্ম্মজ্ঞানহীন, অসংযমী, অমিতাচারীর বলীয়ান সন্তানের কিছু অধিক মাত্রায় 'ষণ্ডা গুণ্ডা' হইবারই সম্ভাবনা হইবে না কি? কিন্তু 'ষণ্ডা গুণ্ডা' অপেক্ষা কীট পতঙ্গও যে ভাল। কীটপতঙ্গেরা আপনারাই কষ্ট পায়; ষণ্ডাগুণ্ডারা পরকে কষ্ট দেয়। ফল কথা, যাঁহারা আমাদের বিবাহ প্রণালীর সংস্কারের প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইউরোপের বিবাহ প্রণালী দেখিয়া ঐরূপ করেন। ইউরোপে লোকে,বিশেষতঃ

আজিকাল,শারীরিক বলের কথাই বেশী ভাবে, শারীরিক বলের কিছু বেশী আদর করে এবং সেই নিমিত্ত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই অধিক বয়সে বিবাহ বিহিত বিবেচনা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যাঁহারা বিবাহ প্রণালী পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী, তাঁহাদেরও শরীরের দিকেই অধিক দৃষ্টি, বোধ হয় যেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি। কিন্তু মানবসৃষ্টির ন্যায় গুরুতর বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইলে, শরীরের দিকে সম্পূর্ণ বা অত্যধিক দৃষ্টিরাখা যারপর নাই অন্যায়, অনিষ্টকর,যুক্তিবিরুদ্ধ, অমানবোচিত। যে ব্যবস্থায় শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি থাকে এবং ধর্ম্মবল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতর বলের প্রতি তদপেক্ষা অধিক দৃষ্টি থাকে, তাহাই মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। ধর্ম্মশীলতা, সংযম, মিতাচার প্রভৃতির দিকে অধিক দৃষ্টি থাকিলে, শরীরের জন্য বেশী ভাবিতে হয় না, বড় বিশেষ ব্যবস্থা করাও অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। যে সকল কারণে সন্তান সন্ততি সচরাচর রুগ্ন, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া থাকে, ধর্ম্মশীলতা, সংযম, মিতাচারাদিতে সে সকল কারণ থাকিতে পারে না, সে সকল কারণের উচ্ছেদ হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন, সংযমী, মিতাচারী

দম্পতী অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হইলেও তাহাদের সন্তান রুগ্ন ভগ্ন হয় না। এক্ষণকার বিবাহ প্রণালী উঠাইয়া দিয়া ইউরোপের বিবাহ প্রণালী প্রচলিত করিলে, আমাদের উপকার হইবে বোধ হয় না, অপকারেরই সম্ভাবনা। সাবিত্রীর জন্মকথায় যে উপায়ের উল্লেখ আছে, প্রকৃত বংশধর পাইবার কামনায় অশ্বপতি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমাদিগকে সেই উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে, নহিলে আমরা কেবল কীট পতঙ্গেরই সৃষ্টি করিতে থাকিব, কখনই প্রকৃত সন্তান, প্রকৃত বংশধর, প্রকৃত মানুষ উৎপাদন করিতে পারিব না। ধর্ম্মশীল হইয়া, সাবিত্রীর পিতার ন্যায় সন্তানোৎপাদন কার্য্যকে পরম ধর্ম্মসাধন বুঝিয়া, তাঁহারই ন্যায় পূজার্চ্চনা সংযম মিতাচারাদি দ্বারা দেবতাদিগের তুষ্টি এবং চিত্ত ও শরীরের শুদ্ধি এবং শক্তিসাধন করিলে আমরা প্রকৃত সন্তান, প্রকৃত মনুষ্য উৎপাদন করিতে পারিব। এইরূপে সন্তানোৎপাদন করিলে আমাদের সন্তানের সংখ্যাও স্বল্পতর হইবে। ধর্ম্মজ্ঞানহীন, অসংযমী, আচারভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া ঘরে ঘরে 'হাঁসের পালের' সৃষ্টি

করিয়া, আমরা আমাদের দারিদ্র্যদুঃখ ও শক্তিহীনতা কেবলই বৃদ্ধি করিতেছি। আর কিছু দিন এইরূপ করিলে, আমাদের দুরবস্থার একশেষ হইবে। সন্তানের মতন সন্তান লাভের অভিলাষী না হইলে, 'হাঁসের পাল' বন্ধ হইবে না। এরূপ সন্তান লাভ করিবার অভিলাষী হওয়া ভিন্ন আমাদের আর শ্রেয়ঃ নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বিষম সমস্যায় পৃথিবী এখনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু কাল পরে এ সমস্যা ভীষণতম হইয়া দাঁড়াইবে। প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায় না দেখিয়া, ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা লোকক্ষয়কারী সমর, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে পর্য্যন্ত মানব কুলের শুভজনক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জা, ঘৃণা ও পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মহাসমর সত্ত্বেও ত পৃথিবীর লোক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ভয়ে ইউরোপের অনেক পণ্ডিত পণ্ডিতা লোকসৃষ্টি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায়ের উদ্ভাবন করিতেছেন। সে সমস্তের প্রয়োগের ন্যায় ঘৃণিত কার্য্য আর হইতে পারে না। তাহাতে মানব প্রকৃতি জঘন্যতম হইয়া

পড়ে; উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। যে প্রবৃত্তির প্রাবল্যের জন্য লোক সংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি, তাহা অদমিত থাকিবে, আর অন্য উপায়ে লোকসৃষ্টি কমিবে, এরূপ হইতেই পারে না। সে প্রবৃত্তিকে দমিত করাই লোক সৃষ্টি কমাইবার প্রশস্ত এবং মানবের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞানাদিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবার উপযুক্ত উপায়। ইউরোপ আজিও জড় জগতে যে প্রতিকারের অনুসন্ধান করিতেছেন, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারত তাহা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। লোকভারে বসুন্ধরাকে যদি বিনাশ প্রাপ্ত হইতে না হয়, তাহা হইলে, এক সহস্র বৎসর পরে হউক, দশ সহস্র বৎসর পরে হউক, সমস্ত মানবজাতিকে একদিন ধর্ম্মজ্ঞানমূলক মানবোচিত প্রণালীতে লোক সৃষ্টি করিতেই হইবে। সাবিত্রীর জন্ম কথায় সেই প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। কঃ পন্থায় বলিয়াছিলাম —একদিন সমস্ত মানবকে ভারতের বাসনা-বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। সাবিত্রীতত্ত্বে বলিতেছি— এক দিন সমস্ত মানবকে ভারতের লোক-সৃষ্টি-বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে।

অনেকে, হয় ত, জিজ্ঞাসা করিবেন—ভাল, সুসন্তান লাভ করিবার জন্য সংযমী ও মিতাচারী হওয়া আবশ্যক, এ কথা যেন একটু সঙ্গত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সন্তানোৎপাদন কার্য্যকে ধর্ম্মসাধন মনে করিতে হইবে, এ কিরূপ কথা—ইহা যেমন অর্থশূন্য তেমনি হাস্যকর কথা নয় কি ?

একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা অর্থশূন্য হাস্যকর কথা নয়। যদি প্রকৃত হিন্দু হও তাহা হইলে অবশ্য জান যে, সকল লোকেরই পিতৃ ঋণ বলিয়া একটী ঋণ আছে। সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃলোকের জলপিণ্ডের স্থিরতা সাধন করিয়া, সে ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। ইহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। ধর্ম্মচর্য্যার্থ যাহা করিতে হয় তাহা ধর্ম্মসাধন। সুতরাং সন্তানোৎপাদনও ধর্ম্মসাধন। যদি জল-পিণ্ডাদির ব্যবস্থায় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে আর একটী কথা বলি শুন। পরোপকার যে পরম ধর্ম্ম, ইহা সকল শাস্ত্রেই বলে। তুমিও বোধ হয় আজিকার দিনে এ কথা অস্বীকার করিতে সাহসী হইবে না। লোকে তৃষ্ণায় জলপান করিবে

বলিয়া, তুমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানা স্থানে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছ; অন্নহীনের জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবে বলিয়া, অতিথিশালা স্থাপিত করিয়াছ; দরিদ্র রোগে প্রাণদান পাইবে বলিয়া, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তুমি মরিয়া গেলে তোমার এমন যে ধর্ম্মানুষ্ঠান, সমস্তই লয়প্রাপ্ত হইবে। তুমি একটী সুসন্তান রাখিয়া গেলে, এই সমস্ত সদনুষ্ঠান সুরক্ষিত হইবে। সন্তানোৎপাদন তোমার পক্ষে ধর্ম্মসাধন হইবে না কি? আর সন্তান কিরূপ সামগ্রী বুঝিয়া দেখিয়া বল, সন্তানোৎপাদন কার্য্যকে ধর্ম্মসাধনরূপ পবিত্র কার্য্য জ্ঞান করা একান্ত আবশ্যক কি না। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব এই কথা বলিয়া গিয়াছেন :—

"সমুদায় ধর্ম্মাচারের বীজ কোথায়—ইহার অনুসন্ধানে বহু দেশের পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে যত্ন করিয়া আসিতেছেন। কেহ বলেন, প্রীতিই ধর্ম্ম বীজ। কেহ বলেন, অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতেই মনুজগণ ধর্ম্ম বীজ লাভ করেন। কেহ বলেন, পরোপকার ভিন্ন ধর্ম্ম বীজ হয় না। কাহার কাহার মতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণে সুখ যাহাতে

সাধিত হয়, তাদৃশ কার্য্য ধর্ম্মকার্য্য। এবম্প্রকার বিবিধ মতবাদের যেটীকে অবলম্বন করা যাউক, কার্য্যকালে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আচার বিচার এবং যুক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। আমি বলি, সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে একটী অপেক্ষাকৃত সহজ নিয়ম বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে—কোন এক বিষয়ে নহে—সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা কর—ধর্ম্মসাধন হইবে। মোটামুটি সমুদায় ধর্ম্মচর্য্যা ঐ এক ভিত্তিমূলে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরেও দেখ, যাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা উন্নতিশীল মানব-জীবনের সার্থকতা সাধন করেন। তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোক উভয় লোকই রক্ষিত হয়। যাঁহারা তাহা না পারেন, তাঁহাদের ইহলোকে মনস্তাপ এবং পরলোকে অধোগতি।”

বড় সত্য কথা। সন্তানকে বিদ্বান করিতে হইলে, পিতাকে বিদ্বান হইতে হয়; সন্তানকে ধার্ম্মিক করিতে হইলে, পিতাকে ধার্ম্মিক হইতে হয়; সন্তানকে সুস্থ বলিষ্ঠ করিতে হইলে পিতাকে সুস্থ

বলিষ্ঠ হইতে হয়। সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা গৃহে, পিতামাতার নিকট, হইয়া থাকে। গৃহে মন্দ শিক্ষা পাইলে, সন্তান মন্দ হয়। এক ব্যক্তি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান অতি অল্প বয়সেই নেশাখোর হইয়া উঠিল। অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত না, সুতরাং ব্যয়সাধ্য মদিরার অভাবে সিদ্ধি খাইতে লাগিল। অতিরিক্ত সিদ্ধি সেবনে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই পাগলের ন্যায় হইল। তাহার পিতা তাহাকে সিদ্ধি খাইতে নিষেধ করিলেন। সে উত্তর করিল—আপনি মদ ছাড়ুন, আমিও সিদ্ধি ছাড়িব। পিতা মদ ছাড়িলেন না, মরিয়া গেলেন; পুত্র এখন আরো উন্মত্তবৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পিতার যথার্থই 'ইহলোকে মনস্তাপ এবং পরলোকে অধোগতি' হইয়াছে। সন্তানকে ভাল করিতে হইলে, পিতার ভাল না হইলে চলে না। সন্তানের জন্য মন্দ পিতাকেও ভাল হইতে দেখা যায়। সন্তান একটু বড় হইলে অনেক মদ্যপায়ী মদ ছাড়িয়া দেয়, অনেক পরস্ত্রীগামী পরদারগমনে বিরত হয়, অনেক কুক্রীড়াসক্ত কুক্রীড়াদি পরিত্যাগ করে। কেবল

যে সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় পিতার এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা নহে; সন্তানের কাছে লজ্জিত হইতে হইবে বলিয়াও ঘটে। অনেক স্থলে দেখা যায়, মানুষ সন্তান হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার, সন্তান হইবার পর অন্য প্রকার। সন্তান হইবার পূর্ব্বে যে দুর্দ্দান্ত, সন্তান হইবার পর সে শান্ত; সন্তান হইবার পূর্ব্বে যে অমিতাচারী ও অমিতব্যয়ী, সন্তান হইবার পর সে মিতাচারী ও মিতব্যয়ী; সন্তান হইবার পূর্ব্বে যে কটুভাষী,সন্তান হইবার পর সে মিষ্টভাষী; সন্তান হইবার পূর্ব্বে যাহার হৃদয় কঠিন, সন্তান হইবার পর তাহার হৃদয় কোমল। সন্তানের ন্যায় রহস্য সংসারে অধিক দৃষ্ট হয় না। সন্তান পিতা মাতার সম্বন্ধে ইন্দ্রজাল স্বরূপ। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মণ কবি গেটে লিখিয়াছেন—"Nothing is more charming than to see a mother with a child upon her arm; nothing is more reverend than a mother among many children." * 'জননীর কোলে শিশু থাকিলে তাঁহাকে যেমন মনোহর দেখায়, তেমন মনোহর আর কিছুই নাই;

* Wilhelm Meister's Apprenticeship নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ সর্গ।

জননীকে বহুসন্তান পরিবেষ্টিতা দেখিলে মনে যেমন সম্ভ্রমের উদয় হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না।' ফলতঃ সন্তান পিতামাতার মূর্ত্তি ও মন যেন ইন্দ্রজালে পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। কিন্তু সন্তানরূপ ইন্দ্রজাল ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের ন্যায় সু-কে কু করিয়া দেয় না, কেবল কু-কে সু করে। সন্তানোৎপত্তির ফলে ভাল পিতামাতা মন্দ হইয়া যায় না, মন্দ পিতামাতাই ভাল হইয়া থাকে। সন্তানের ন্যায় সামগ্রী কি আর আছে? সন্তান মানুষের অসীম অপূর্ব্ব উন্নতির কারণ। সন্তানের জন্য মানুষ ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, অর্থ বল, মানমর্য্যাদা বল, সকল বিষয়ে উন্নতি করিতে বাধ্য হয় এবং অনেক স্থলে আহ্লাদ ও আগ্রহ সহকারে উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। সন্তানোৎপাদন কার্য্যকে ধর্ম্মসাধন জ্ঞান করা অতীব কর্ত্তব্য, নিতান্ত আবশ্যক নহে কি?

আমরা এখন সন্তানলাভকে ধর্ম্মসাধন মনে না করিয়া, নিতান্ত অসংযমী, অমিতাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া যে সকল সন্তানোৎপাদন করিতেছি, তাহারা সন্তান নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহারা কীট পতঙ্গের মধ্যে গণ্য।

তাহাদের শারীরিক বলও যেমন, মানসিক বলও তেমনি, ধর্ম্মবলও তেমনি। তাহাদের সংখ্যাধিক্যে আমরা বিব্রত। সাবিত্রীর জন্ম কথা পড়িয়া আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। অশ্বপতির ন্যায় ধর্ম্মসাধন কামনায় সংযমী জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্তানোৎপাদন করিলে, আমাদের প্রকৃত সন্তান হইবে, ধর্ম্মশীল মেধাবী সুস্থ বলিষ্ঠ কৃতী দীর্ঘজীবী বংশধর হইবে। ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য ও সংযমাদি হেতু আমাদের সন্তানসংখ্যাও কম হইবে। তাহা হইলে আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ এবং শোকতাপাদিও কমিবে। ধর্ম্ম-শীলতা, সংযম, মিতাচার, সুখ, সন্তোষ প্রভৃতি শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা বৃদ্ধির বিশেষ অনুকূল। সুতরাং মেলেরিয়াদি সত্ত্বেও আমরা রোগ হইতে বহুল পরিমাণে মুক্তি লাভ করিয়া, নানা প্রকার উন্নতি করিবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইব। বিলাসপ্রিয়তার জন্য আমাদের যে সমস্ত কষ্ট ও গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে তাহারও অবসান হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাবিত্রীর বিবাহ।

সাবিত্রীর জন্মকথার পরই মহাভারতকার তাঁহার বিবাহের কথা কহিয়াছেন। যেন সাবিত্রীর জন্ম ও বিবাহের মধ্যে আর কিছুই ঘটে নাই। অমন বয়সে সকল ছেলে মেয়ের যাহা ঘটিয়া থাকে সাবিত্রীরও অবশ্য তাহা ঘটিয়াছিল, অন্য ছেলের ন্যায় তিনিও হয় ত দুরন্ত ছিলেন, হয়ত সহজে দুধ খাইতেন না, মা গুণ গুণ করিয়া গান না করিলে হয়ত ঘুমাইতেন না, হয়ত পড়িয়া গিয়া দুইবার ঠোঁট কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন আর একবার একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, হয়ত ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত

ঋগ্বেদ খানা মুখস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, হয়ত একবার ছয়মাস মাসীর বাড়ীতে ছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শৈশব ও বাল্যের এইরূপ বহুতর কথা ইউরোপীয় প্রণালীতে লিখিত জীবন চরিতে থাকে। আর এইরূপ কথা যত অধিক থাকে ঐ সকল জীবন চরিতও সাধারণতঃ তত উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। বস্‌ওয়েল সাহেবের লিখিত ডাক্তার জনসনের জীবন চরিতে এইরূপ কথার পরিমাণ অতিশয় অধিক; সেই জন্য উহা এক রূপ আদর্শ জীবনচরিত বলিয়া অনেকের দ্বারা প্রশংসিত হয়। এখন বাঙ্গালা ভাষাতেও এই প্রণালীতে জীবনী লিখিত হইতেছে। তজ্জন্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা বহুল পরিমাণে এবং অত্যধিক শ্রম সহকারে সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতেছে। এ প্রণালী কিন্তু আমাদের প্রাচীন প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। এইত সাবিত্রীর আখ্যায়িকাতেই দেখা যাইতেছে, জন্মের কথার পরই বিবাহের কথা। অত বড় যে রামায়ণ, রামের কথায় পরিপূর্ণ—পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গা, রাগ করিয়া দুইবার মামার বাড়ীতে পলাইয়া যাওয়া, মাকে না বলিয়া মাসীর বাড়ী যাওয়া—এ প্রকার কথা উহাতেও

নাই। ফলতঃ পুরাণের কোন নরনারীর আখ্যায়িকাতেই এরূপ কথা দেখা যায় না। আমাদের ও ইউরোপীয়দিগের লিখিত জীবনাখ্যায়িকায় ইহা আর একটী গুরুতর প্রভেদ। এ প্রভেদও লক্ষ্য করা আবশ্যক। ইহার অর্থ স্থানান্তরে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দু স্ত্রীর জন্ম ও বিবাহের মধ্যে এখন সচরাচর যত সময়ের ব্যবধান থাকে, সাবিত্রীর জন্ম ও বিবাহের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক সময়ের ব্যবধান ঘটিয়াছিল। এখন হিন্দু স্ত্রীর বিবাহ কুমারী অবস্থায় হয়; সাবিত্রীর বিবাহ যৌবন প্রাপ্তির পর হইয়াছিল।

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূবহ॥
তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সংমেনিরে জনাঃ॥

অর্থাৎ

সেই নৃপকুমারী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতি লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনস্থা হইলেন। সেই বিশাল-নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে

'ইনি দেবকন্যা, মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন' এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি নিবিড় নিতম্বিনী হইয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

তাস্তুপদ্মপলাশাক্ষীং জলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবাধিতঃ॥

অর্থাৎ

ফলতঃ পদ্মপলাশাক্ষী সাবিত্রী তেজে এরূপ জাজ্বল্যমানা ছিলেন যে, তদীয় কান্তিপুঞ্জে অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বরণ করিতে পারিল না।

তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সাহস করিল না বটে। কিন্তু এখন তাঁহার নিজের মনে বিবাহিতা হইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। তিনি একদিন স্নানান্তে ইষ্টদেবতার পূজা করতঃ ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। পিতা বলিলেন—

পুত্রি প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ॥

অর্থাৎ

পুত্রি! তোমার সম্প্রদান কাল উপস্থিত হইয়াছে, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে না; অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণসদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর।

অশ্বপতি স্পষ্ট ভাষায় যৌবনপ্রাপ্তা কন্যা সাবিত্রীকে বলিতেছেন—তোমার সম্প্রদান কাল উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং যদি এরূপ বলা যায় যে, সেই প্রাচীন কালে কোন কোন স্থলে স্ত্রীলোকে যৌবন প্রাপ্ত হইলে তবে তাহাদের বিবাহের কাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইত, তাহা হইলে অন্যায্য কথা বলা হয় না। সকল স্থলে এরূপ বিবেচিত না হইয়াও থাকিতে পারে, এ প্রকার অনুমান করিবারও হেতু আছে। অশ্বপতির কথায় বোধ হইতেছে যে, তখন পিতা অগ্রে কন্যার নিমিত্ত পাত্র নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেন, পরে, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কন্যাকে স্বয়ং পতি অন্বেষণ করিবার অনুমতি দিতেন। পিতা সম্ভবতঃ কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেন এবং অবিলম্বে

পাত্র পাইলেও কন্যার যৌবনলাভের পূর্ব্বে কখনই তাহাকে সম্প্রদান করিতেন না, এরূপ বিবেচনা করিবার হেতু নাই। অশ্বপতির কথাতেই বুঝা যায় যে, কন্যাকে পতি অন্বেষণ করিবার অনুমতি দিবার পূর্ব্বে পাত্র পাইলে তিনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে পাত্রস্থা করিতেন এবং তাঁহার সম্প্রদানকার্য্য কন্যার যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বেও ঘটিতে পারিত। যাহা হউক, যৌবনলাভের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দিবার রীতি তখন থাকুক আর নাই থাকুক, যৌবনলাভের সময় যে কন্যার বিবাহের কাল বলিয়া বিবেচিত হইত, অশ্বপতির কথায় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বেদপুরাণাদিতে যৌবনপ্রাপ্তির পর কন্যার বিবাহের বহুতর উল্লেখ আছে। অতএব ও কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না---অস্বীকার করিবার আবশ্যকতাও নাই। অনেকে ঐরূপ উদাহরণগুলিকে বাল্যবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বা অবৈধতার প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান করেন। যাঁহারা মনে করেন যে, বাল্য-বিবাহ শারীরিক মানসিক প্রভৃতি সকল প্রকার দুর্ব্বলতার হেতু, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বাল্য-

বিবাহের ফল অতি শোচনীয় জানিয়া যৌবনপ্রাপ্তি হইলে কন্যার বিবাহ দিতেন, তখন আমাদেরও বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিয়া যৌবনবিবাহ প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই দুইটী কথাই ভ্রমাত্মক। তখনকার যৌবনবিবাহের গূঢ় অর্থ বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বুঝাও বড় কঠিন নয়। যে কথাগুলি কহিয়া অশ্বপতি সাবিত্রীকে পতি অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে কন্যার বিবাহের জন্য তিনি কিছু চিন্তিত—কন্যার পাণিগ্রহণার্থ কেহ আসিতেছে না বলিয়া তিনি যেন একটু অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ আদেশ দিবার সময় অশ্বপতি কন্যাকে পতির অন্বেষণে তৎপর হইতে বলিয়াছিলেন ঃ—

ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।

অর্থাৎ

তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও।

সাবিত্রী যৌবন লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন, অথচ তাঁহার বিবাহ হইতেছে না, এজন্য অশ্বপতি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন

আর্য্যেরা শারীরিক শক্তি বর্দ্ধনার্থ আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় যৌবনে কন্যার বিবাহ দিতেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাবিত্রীর বিবাহের কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া অশ্বপতির এই ব্যস্ততা, অস্থিরতা, চিন্তাকুলতা কেন? কন্যার যৌবন লক্ষণ দেখিলেই ত ইউরোপীয়েরা তাহার বিবাহের নিমিত্ত ব্যস্ত হয় না। তাহারা বরং কন্যার যৌবনের পরিপক্কতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, কখন কখন যৌবন অতিক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ না দেওয়াই ভাল বিবেচনা করে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে আধুনিক ইউরোপে কন্যার বিবাহের কাল বিলম্বিত হয়, যুবতী কন্যার বিবাহে প্রাচীন আর্য্যদিগের সে উদ্দেশ্য ছিল না।

সাবিত্রীর বিবাহের বিলম্ব দেখিয়া অশ্বপতির ব্যস্ততা ও চিন্তাকুলতার কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ—

শ্রুতং হি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি গদতো মে বচঃ শৃণু॥
অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপয়ন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা॥
ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু॥

অর্থাৎ

হে কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজাতিদিগকে যে বচন পাঠ করিতে শুনিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর। যে পিতা কন্যা দান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে পতি ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন; এবং যে পুত্র, ভর্ত্তৃহীনা জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। তুমি আমার এই বচন শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তার অন্বেষণে ত্বরান্বিতা হও;—যাহাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।

স্পষ্টই বলা হইল যে কন্যাদান করা ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে পিতার একান্ত কর্ত্তব্য—কন্যার যৌবনলক্ষণ দেখিয়া তাহার বিবাহ দিতে বিলম্ব করিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র মতে পিতা দেবতাদিগের নিকট নিন্দনীয় হন। ইউরোপে কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতা আপন অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন না; কন্যা যৌবনপ্রাপ্তির পর অবিবাহিতা থাকিলে পিতা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবেন, এরূপ সংস্কারও তথায় কাহারও নাই। অশ্বপতির ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখে বুঝা যায় যে, প্রাচীন

আর্য্যেরা ধর্ম্মার্থই কন্যার বিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মার্থই কন্যার যৌবনোদ্গম সত্ত্বে তাহার বিবাহ না দেওয়া বা বিবাহ দিতে বিলম্ব করা, পিতার পক্ষে নিন্দনীয় বা গর্হিত কার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বিবাহ-প্রণালীকে আধুনিক ইউরোপের শারীরিক শক্তি-সাধনোদ্দেশ্যমূলক বিবাহ প্রণালীর অনুরূপ ভাবিয়া যাঁহারা বলেন যে, বালিকার বিবাহ উঠাইয়া দিয়া যুবতীর বিবাহ প্রচলিত করিলে আমরা আমাদেরই প্রাচীন বিবাহ প্রণালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

অনেকে বলেন যে, বেদবিহিত বিবাহপ্রণালী আধুনিক ইউরোপের বিবাহপ্রণালীর ন্যায় শারীরিক শক্তিসাধনোদ্দেশ্যমূলক ছিল—সুতরাং অতি উৎকৃষ্টই ছিল। কথাটা ঠিক কি না, দেখা যাউক্। "হিন্দু-কন্যার বিবাহ সংস্কার কোন্ সময়ে হওয়া শাস্ত্রসম্মত অর্থাৎ ঋতুলাভের পূর্ব্বে বা পরে" এই নাম দিয়া শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভুবনেশ্বর বাবু পণ্ডিত; চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী; তিনি এইরূপ আরও

অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি এই পুস্তিকাখানিতে ঋগ্বেদ হইতে দুইটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাতে ঋতুলাভের পর হিন্দুকন্যার বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ঋক্ দুইটী এইঃ—

উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভীরিলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং সতে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি॥
উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলমহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ॥

ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০ম, ৭অ, ৮৫সূ, ২১।২২ ঋ।

রমেশ বাবু ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ঃ—হে বিশ্বাবসু এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্ত হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর, সেই তোমার ভাগ স্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও। ২১।

হে বিশ্বাবসু, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার দ্বারা তোমার পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য

কি বেদ কি পুরাণ, সর্ব্বত্র তাহাদের বিবাহ অবশ্য-কর্ত্তব্য সংস্কার বলিয়া বিবেচিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যৌবনোদ্‌গমের পর অবিবাহিতা থাকিলে স্ত্রীলোকে ব্যভিচারিণী অথবা অবৈধ ভোগাভিলাষিণী হইতে পারে, এই ভয়ে, কি বেদ কি পুরাণ, সর্ব্বত্র যৌবনোদ্‌গম হইলে তাহাদিগকে 'স্বামীসংসর্গিণী' করিয়া দিবার নিমিত্ত ব্যস্ততাও দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের বিবাহ অবশ্য-কর্ত্তব্যতার ব্যবস্থা করিবার এবং যৌবনোদ্‌গম হইলেই তৎপর হইয়া তাহাদের বিবাহ দিবার ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ, বোধ হয় অন্য অর্থ হইতে পারে না। যৌবনোদ্‌গমের পর অবিবা-হিতা থাকিলে স্ত্রীলোকের শরীর কলুষিত হইতে পারে; শরীরও যদি কলুষিত না হয়, মন কলুষিত হইতে পারে। মন কলুষিত হইলে অনিষ্টের আর কিছু বাকি থাকেনা। মলিনতা মনে, পাপও মনে। সাবিত্রী মনে মনে সত্যবানকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরে সত্য-বানের মৃত্যু হইবে শুনিয়া অশ্বপতি তাঁহাকে অন্য বর অন্বেষণ করিতে বলিলেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন—

সকৃদংশো নিপততি সকৃত কন্যাপ্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা নদ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্।
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥

অর্থাৎ

অংশ, অর্থাৎ পৈতৃকাদি বিষয়ের বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা, একবার নিপতিত হয়; লোকে কন্যাকে একবার প্রদান করে, এবং 'দান করিলাম' এ কথাও একবার বলে; এই তিন বিষয় এক এক বারই হইয়া থাকে। অতএব আমি একবার যাঁহারে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ু হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণই হউন তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারি না। দেখুন, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করে এবং পরিশেষে কর্ম্মদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে ক্রিয়তে

কর্ম্মণা পশ্চাৎ—যাহা করিবার অভিলাষ তাহা সর্ব্বপ্রথমে মনে স্থিরীকৃত হয়, তৎপরে তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা হয়, শেষে তাহা সম্পন্ন করা হয়। অতএব কর্ম্মের মূল মনে। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম যদি করাও না হয়, তথাপি মনে যদি তাহার মূলের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে মন দূষিত হইবার জন্য দুষ্কর্ম্ম কৃত হইবার যে অনিষ্ট তাহা সম্পূর্ণরূপেই ঘটে। সাবিত্রী মনকেই প্রমাণ বুঝিয়া অন্য বর অনুসন্ধান করিতে অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত কাজ করিয়াছিলেন। ওরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার মন অপবিত্র হইয়া পড়িত এবং মন অপবিত্র হইলে চরিত্রও অপবিত্র হইয়া পড়ে। সাবিত্রী ধর্ম্মরূপিণী—তাঁহার অসীম তেজ, অসীম দৃঢ়তা, অসীম মানসিক শক্তি। যাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি বৎসরান্তে কালগ্রাসে পতিত হইবেন, এই সা ঘা িক কথা শুনিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না, ভীত হইলেন না—স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন, সত্যবান ভিন্ন আর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না। সাবিত্রী বলিয়া এইরূপ হইল—মন এবং চরিত্র দুইই অকলুষিত রহিল; মন এবং

চরিত্রের বিশুদ্ধতা নষ্ট না হইয়া উৎকৃষ্টতাই প্রাপ্ত হইল। আবার বলি, সাবিত্রী বলিয়া এইরূপ হইল। আর কেহ হইলে এরূপ না হইতেও পারিত। না হইলে, মন এবং চরিত্র দুইই ত কলুষিত হইত। মন ও চরিত্র একবার কলুষিত হইলে বার বার কলুষিত হইতে পারে। বোধ হয় প্রাচীনকালে যাহাদের যৌবনোদ্গমের পর বিবাহ হইত তাহাদের অনেকের মন ও চরিত্র এইরূপে কলুষিত হইত। কন্যা যৌবন লাভ করিয়া যাহাকে পতিরূপে মনোনীত করে, পিতা তাহাকে কন্যাদান করিতে না পারিলে, কন্যার মন এইরূপে কলুষিত হইবারই কথা। সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতে অনেক স্থলে এইরূপ হইত। ইংরাজ সমাজে কখন বাস করি নাই, সুতরাং সে সমাজের বিবাহব্যাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমার নাই। কিন্তু ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, অনেক যুবতীকে আপন মনোনীত ব্যক্তি ছাড়িয়া পিতামাতার আদেশে অন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করিতে হয় অথবা গৃহত্যাগ করিয়া ব্যভিচারে নিমজ্জিত হইতে হয়। যৌবনোদ্গম পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ না হইলে এইরূপ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ হইতে

থাকিলে অধর্ম্ম ও অপবিত্রতার বৃদ্ধি এবং ধর্ম্মশীলতার হ্রাস বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—ধর্ম্মজ্ঞানও অপরিষ্কার, অপ্রখর এবং নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। শারীরিক বল বল, মানসিক বল বল, আধ্যাত্মিক বল বা ধর্ম্মবলের সমান কোন বলই নয়। ভারতের প্রাচীন আর্য্যদিগের মতে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই জগতকে ধারণ বা রক্ষা করিতে পারে না। গৃহস্থাশ্রম সকলপ্রকার ধর্ম্মচর্য্যার স্থান। গৃহস্থাশ্রমের মূল বিবাহ। ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যেরা ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে শারীরিক শক্তিলাভকে সেই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার ন্যায় ভ্রমান্ধতা বা বাতুলতা আর হইতে পারে না। তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি ছিল, ধর্ম্মের উপর। তেমন দৃষ্টি আর কিছুরই উপর ছিল না। তাঁহারা জানিতেন, ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে অপর সমস্ত সেই সঙ্গে রক্ষিত হইয়া যায়। এই জন্যই কন্যার যৌবনোদ্গম হইলে তাহার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এবং যখন বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যস্ততা সত্ত্বেও কন্যার মন ও দেহ কলুষিত হইতেছে বা হওয়া সম্ভব, তখন গোভিল গৃহ্যসূত্রে ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন যে দারপরিগ্রহার্থ 'নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা,' ঋতুমতী হয় নাই এমন কন্যাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তাহাতে অনগ্নিকার বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই বটে; কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়া যে আবশ্যক তাহা এক রকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে নগ্নিকার বিবাহই এক মাত্র ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে আমাদের যে বিবাহ প্রণালী ছিল এখনও ঠিক সেই বিবাহপ্রণালী রহিয়াছে। কেবল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধি পক্ষে পূর্ব্বে ঐ প্রণালীর যে অংশটুকু ব্যাঘাতের হেতুস্বরূপ ছিল, প্রাচীন ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা মতেই এখানকার প্রণালীতে সে অংশ টুকু নাই। বোধ হয় প্রাচীনতম কালে অনেক স্থলে কন্যার স্বামীসঙ্গ লাভের শারীরিক উপযুক্ততার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যৌবনোদ্গমে তাহাদের বিবাহ দেওয়া হইত। কিন্তু কন্যার স্বভাব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি যে তখন একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। ছিল বলিয়াই যৌবনোদ্গম হইলেই ব্যস্ততা সহকারে কন্যার বিবাহ দেওয়া হইত। ক্রমে কিন্তু শারীরিক যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা অবিধেয় বিবেচিত হইয়াছিল। তখন বিবা-

হের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, সেই প্রাচীনতম প্রণালী সুসংস্কৃত হইয়াই এখনকার প্রণালী হইয়াছে। কিন্তু সে প্রণালী যখন ছিল এখনকার প্রণালীও তখন ছিল। ইদানীন্তন কালের অত্যাচারপ্রিয়, অদূরদর্শী, অর্থগৃধ্নু, দুর্ব্বৃত্ত, নীচমনা বামণগুলা দেশটাকে উৎসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ঋষিদিগের প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট মানবোচিত বিবাহপ্রণালী নষ্ট করিয়া একটা জঘন্য পাশব বিবাহ প্রণালী উদ্ভাবিত করে নাই। আমাদের বিবাহ প্রণালী ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মপ্রধান জাতিরই উপযুক্ত প্রণালী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শারীরিক বল সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহারা আপনারাই অসীম শারীরিক বলে বলীয়ান ছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির বাহুবলের কথা কহিতে কহিতে যাঁহারা আনন্দে উন্মত্ত হইতেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুস্থকায় মহাবলশালী ছিলেন এবং শারীরিক বলের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেন। শারীরিক বললাভের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন ধর্ম্মসর্ব্বস্ব—ধর্ম্মসর্ব্বস্বের ন্যায় ধর্ম্মশীলতায়, ধর্ম্মচর্য্যায়, সংযমে, মিতাচারে তাঁহারা শারীরিক বলের মূল

নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতার অমন মূলও আর নাই। উত্তর পশ্চিমাদি প্রদেশে সে মূল এখনও নষ্ট হয় নাই, সেইজন্য তথায় শারীরিক শৌর্য্য বীর্য্য এখনও রহিয়াছে। আমরা আজিকার বাঙ্গালী সে মূলের বিষয় অবগত থাকিয়াও তৎপ্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন। তজ্জন্য আমরা কীট পতঙ্গবৎ হইয়া পড়িতেছি। এ কথা এস্থলে আর অধিক কহিব না। প্রথম অধ্যায়ে অনেক কহিয়াছি।

পিতার আদেশ পাইয়া সাবিত্রী বর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কি প্রকারে বহির্গত হইয়াছিলেন, লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর অন্বেষণার্থ তিনি একক অথবা পরিচারিকা মাত্র লইয়া যান নাই। তাঁহার সঙ্গে কে যাইবে তাঁহার পিতা বলিয়া দিয়াছিলেন।

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
ব্যাদিদেশানুয়াতঞ্চ গম্যতাঞ্চেত্যচোদয়ৎ॥

অর্থাৎ

রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সাবিত্রীও দ্বিরুক্তি না করিয়া পিতার পদধূলি লইয়া তাঁহার বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগের সঙ্গে বরান্বেষণে গমন করিলেন ঃ—

সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ব্রীড়িতেব তপস্বিনী।
পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্॥
সা হৈমং রথমাস্থায় স্থবিরৈঃ সচিবৈর্ব্বৃতা।
তপোবনানি রম্যানি রাজর্ষীণাং জগাম হ॥

অর্থাৎ

তপস্বিনী সাবিত্রী তখন লজ্জিতার ন্যায় হইয়া পিতার বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক তদীয় চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই নির্গত হইলেন। তিনি স্থবর্ণময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববর্গে পরিবৃতা হইয়া রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবন সমুদায়ে গমন করিলেন।

সাবিত্রী যুবতী—স্বয়ং বর খুঁজিতে যাইতেছেন। তিনি যে পুরুষ ভুলাইবার মতন বেশভূষাদি করিয়াছিলেন, মহাভারতকার তাহা বলেন নাই। তখনকার রাণী ও রাজকুমারীদের অনেকগুলা করিয়া সখী

থাকিত। তাহারাও এক একটা রাণী রাজকুমারীর ন্যায় সাজসজ্জা করিত—গান গাহিত,বাজনা বাজাইত, বিরহের গল্প বলিত, রাণীরাজকুমারীদের মনের কথায় কথা কহিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন দুই চারিটা সখী যে সাবিত্রীর সঙ্গে গিয়াছিল, মহাভারতকার তাহাও বলেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন যে, পিতা জনকতক বুড়া মন্ত্রীকে মেয়ের সঙ্গে যাইতে বলিলেন, মেয়েও জনকতক বুড়া মন্ত্রী সঙ্গে লইয়া বর খুঁজিতে বাহির হইলেন। ইউরোপের যুবতীরা নিশ্চয়ই যুবতী সাবিত্রীর মতন বেশভূষা না করিয়া কেবল কতকগুলা বুড়া সঙ্গে লইয়া বর ধরিতে যায় না। তাহাদিগকে কখন বর ধরিতে যাইতে দেখি নাই। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতে গিয়া তাহাদিগকে বর ধরিতে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন এ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বিবেচনাও করি নাই। ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া এবং সাহেব বিবিদিগের ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিয়াছি, আমাদের সাবিত্রীর ধরণের বর ধরিতে যাইবার রীতি বিবিদের মধ্যে একেবারেই নাই। সাবিত্রী ভুলিতে বা ভুলাইতে যান

নাই। তিনি গিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক গুণবান সুবংশজাত রাজজামাতা হইবার যোগ্য পুরুষ খুঁজিতে। তাই তিনি 'পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্', 'পিতার বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই', পিতার বিজ্ঞ অভিজ্ঞ প্রবীণ মন্ত্রীদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপ লোকের দ্বারা পরিচালিত না হইলে যুবতী কুলকন্যার যোগ্য ব্যক্তি নির্ণয় করা সহজ হয় না। পতিনির্ব্বাচনে যুবতীর কিছু বেশী আবেগবতী, কিছু বেশী মোহাভিভূতা হইয়া ভ্রমে পতিত হওয়াই সম্ভব। এমন যে সাবিত্রী, তিনিও একটী ভ্রম করিয়াছিলেন। পতি অন্বেষণ করিবার আদেশ দিবার সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন :—

প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্যস্ত্বয়া মম।
বিমৃষ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্॥

অর্থাৎ

যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হইবেন, আমার নিকটে তাঁহার কথা নিবেদন করিও; এখন তুমি ইচ্ছানুসারে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনা পূর্ব্বক তোমারে সম্প্রদান করিব।

অশ্বপতি যখন সাবিত্রীকে বলিয়া দিলেন,—তোমার যিনি প্রার্থনীয় হইবেন তাঁহার কথা আমাকে জানাইও, তুমি এখন ইচ্ছানুসারে বরণ কর, আমি পরে বিবেচনা করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিব,—সাবিত্রীর তখন বুঝা উচিত ছিল যে, তাঁহার নিজের নির্ব্বাচন চূড়ান্ত হইবে না, তাঁহার পিতার মতসাপেক্ষ হইবে, তিনি আপন ইচ্ছানুসারে বরণ করিবেন বটে কিন্তু তাঁহার পিতা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিবেন। পিতা যদি তোমাকে আমায় সম্প্রদান করেন তাহা হইলে তুমি আমার পতি হইবে—যৌবনসুলভ আবেগে সাবিত্রীর ন্যায় রমণীও এইভাবে সত্যবানকে মনে মনে বরণ করিতে সমর্থা হয়েন নাই। ইউরোপের যুবতীরা বিবাহকে যেরূপ কার্য্য মনে করিয়া যে ভাবে পতি অন্বেষণ করিতে যায়, সাবিত্রী বিবাহকে তদপেক্ষা অনেক গুরুতর কার্য্য ভাবিয়া, সেভাব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অতি গম্ভীর ভাবে পতি অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তথাপি একটী ভুল করিয়াছিলেন। যৌবন বিবাহে এতই সঙ্কট।

কোর্টসিপে ইউরোপের যুবতীরা বরকে বুঝিবার ও

ভুলাইবার চেষ্টা করে। ইউরোপীয়দিগের কোর্টসিপ কখন দেখি নাই। দেখিবার প্রয়োজনও নাই। শুনিয়াছি, অনেক স্থলে কোর্টসিপ ভুলাইবার মুগ্ধ করিবার মজাইয়া ফেলিবার কল। যাহা শুনিয়াছি তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। কোর্টসিপ যে অনেক স্থলে ঐরূপ ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাবিত্রী যুবতী হইয়াও কোর্টসিপ কি কোর্টসিপের ন্যায় কিছু করেন নাই। রাজর্ষিগণের তপোবনে গিয়া তিনি কি করিয়াছিলেন?

মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
বনানি ক্রমশস্তাত সর্ব্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত॥
এবং তীর্থেষু সর্ব্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাত্মজা।
কুর্ব্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশংজগামহ॥

অর্থাৎ

তথায় তিনি মাননীয় বৃদ্ধবৃন্দের চরণাভিবন্দনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। নৃপনন্দিনী সাবিত্রী এইরূপে সমুদয় তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ধন দান করিতে করিতে নানা স্থানে বিচরণ করিলেন।

বিবাহ বড় গুরুতর কার্য্য, স্ত্রীজাতির ধর্ম্মসাধনের

একমাত্র উপায় এইরূপ বুঝিয়া, সাবিত্রী সমস্ত বৃদ্ধদিগের সম্মাননা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তীর্থে তীর্থে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে ধনদান করিয়াছিলেন। সাবিত্রী কোর্টসিপ না করিয়াছিলেন এমন নয়। ইউরোপীয় রমণীগণের অপেক্ষা অনেক অধিক একাগ্রতা সহকারে, অনেক অধিক আয়াসসাধ্য কোর্টসিপ করিয়াছিলেন। তিনি তপোবনে তপোবনে, তীর্থে তীর্থে ধর্ম্মাত্মাদিগের সহিত কোর্ট-সিপ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যেখানে বিবাহ-প্রণালীর ভিত্তি ধর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, কেবল সেই খানেই সাবিত্রীর ন্যায় কোর্টসিপ সম্ভব, অন্যত্র অসম্ভব। অপর পক্ষে, যেখানে সাবিত্রীর ন্যায় কোর্টসিপ কেবল সেইখানেই বিবাহ প্রণালীর ভিত্তি ধর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, অন্য কোথাও নহে। প্রাচীন ভারতের যুবতীর বিবাহের যে প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছি, অশ্বপতির যুবতী কন্যার কোর্টসিপে তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

সত্যবানকে কন্যাদান করিবার সময় অশ্বপতি অপূর্ব্ব মহত্ত্ব, মহানুভবতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়

দিয়াছিলেন। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন রাজ্য হারাইয়া দৃষ্টিহীন হইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া তখন অতি হীনাবস্থায় তপস্বীর ন্যায় বনে বাস করিতেছিলেন। তখন পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অশ্বপতির ন্যায় বৈভবশালী রাজার রাজপ্রাসাদে আসিবার মতন কায়িক মানসিক এবং আর্থিক অবস্থা তাঁহার ছিল না। মহাত্মা অশ্বপতি সেই জন্য আপনিই কন্যাকে লইয়া তাঁহার বনমধ্যস্থ কুটীরে গমন করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
সমানিন্যে চ তৎ সর্ব্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপ॥
ততো বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ সর্ব্বান্ ঋত্বিজঃ সপুরোহিতান্
সমাহূয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যয়া॥

অর্থাৎ

অনন্তর মহীপতি অশ্বপতি কন্যাপ্রদানের বিষয়ে নারদের কথিত সেই বাক্যই বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে বিবাহের উপযোগী সমস্ত সম্ভার আহরণ করাইলেন; পরে সমুদয় ঋত্বিক, পুরোহিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ দিবসে কন্যা-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

সুবিচক্ষণ অশ্বপতি তখনও দ্যুমৎসেনকে আপন অভিপ্রায় পর্য্যন্ত জ্ঞাত করান নাই। তিনি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলে—

তস্যার্ঘ্যমাসনঞ্চৈব গাঞ্চাবেদ্য স ধর্ম্মবিৎ।
কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ॥

অর্থাৎ

ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন তাঁহারে অর্ঘ্য, আসন ও গো প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগ্রে অশ্বপতির অভিপ্রায় অবগত হইলে পাছে দ্যুমৎসেন আপনিই কষ্ট স্বীকার করিয়া পুত্রকে লইয়া কন্যার গৃহে আগমন করেন, বোধ হয় এই জন্যই অশ্বপতি তাঁহাকে পূর্ব্বে কোন কথা বলেন নাই। অশ্বপতি কন্যাকে লইয়া দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গিয়া বড়ই মহানুভবতার কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার যে প্রকারে রাজ্যভ্রষ্ট, চক্ষুহীন, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হীনাবস্থাপন্ন কিন্তু মহাধর্ম্মপরায়ণ দ্যুমৎসেনের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বের অতি রমণীয় বিকাশ হইয়াছিল। অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি পদব্রজে দুঃস্থ নরপতির নিকটে গমন করিয়াছিলেন :—

মেধ্যারণ্যং স গত্বা চ দ্যুমৎসেনাশ্রমং নৃপঃ।
পদ্ভ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং রাজর্ষিং তমুপাগমৎ ॥

অর্থাৎ

পবিত্র অরণ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপনীত হইয়া সেই নরপতি দ্বিজাতিগণের সহিত পদব্রজেই সেই রাজর্ষির সন্নিহিত হইলেন।

অশ্বপতির ন্যায় মহাপুরুষেরই ত সাবিত্রীর ন্যায় কন্যা হইয়া থাকে।

কাশীরাম লিখিয়াছেন ঃ—

একান্তে বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হইতে সত্যবানে আনিল তখন ॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি ॥

ইহা মহাভারতকারের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে অশ্বপতির মহত্ত্ব মহানুভবতাদি সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার অনেক ধনবান লোকে দরিদ্রের ছেলেকে আপন আপন গৃহে আনাইয়া তাহাদের সহিত যেরূপ কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, ইহা ঠিক সেই রূপ। প্রাচীন আর্য্য মহাপুরুষকে এখনকার বাঙ্গালী সাজাইয়া যে বিষম ভ্রম করা হইয়াছে তাহা কাহার

ভ্রম,ঠিক বলিতে পারি না। শুনা যায় কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের মুখে ভারতকথা শুনিয়া আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে গ্রন্থ বঙ্গের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভ্রম কথক মহাশয়দিগের দ্বারা কৃত হইয়া থাকিলেও, উহার অধিক আলোচনা অকর্ত্তব্য। কথক মহাশয়েরাও বঙ্গের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তবে একথা বলা আবশ্যক যে, যে সকল বাঙ্গালী সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরাজীতে পারদর্শী হইতেছেন, তাঁহাদের রামায়ণ মহাভারতাদির মহামহিমাময় কথার কথকতায় নিযুক্ত হইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাবিত্রীর বধূত্ব।

সাবিত্রীর বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুরের আশ্রমে রাখিয়া আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। বিবাহ হইলেই স্ত্রীলোকে বধূ হয়। সাবিত্রী এখন দ্যুমৎসেন ও দ্যুমৎসেনপত্নীর বধূ হইলেন। বধূ হইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম যে কার্য্যটী করিলেন তাহা যেমন সুন্দর তেমনি তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি রাজ্যেশ্বর পিতার প্রদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি খুলিয়া ফেলিয়া রাজ্য-

ভ্রষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত শ্বশুরের অরণ্যাশ্রমের উপযোগী বল্কল ও কাষায় বসনাদি পরিধান করিলেন।

গতে পিতরি সর্ব্বাণি সংন্যস্যাভরণানি সা
জগৃহে বল্কলাণ্যেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ॥

অর্থাৎ

তাঁহার পিতা গমন করিলে পর তিনি সমুদয় আভরণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বল্কল ও কাষায় বসন সমস্তই পরিধান করিতে থাকিলেন।

সাবিত্রী রাজকন্যা, রাজনন্দিনীর ন্যায় বস্ত্রাভরণে ভূষিতা হইয়া থাকিলে, তাঁহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী রুষ্ট বা বিরক্ত হইতেন না। তাঁহার পতি সত্যবান তাঁহার শ্বশুর শ্বশ্রূর এক মাত্র সন্তান, যথার্থই "অন্ধের নড়ি।" তিনি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভুষিতা থাকিলে তাঁহাদের পরম আনন্দই হইত। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, তাঁহার হৃদয় যেমন কোমল তেমনি উদার। বিবাহের পর তিনি আর আপনাকে রাজ্যেশ্বর অশ্বপতির কন্যা মনে করিলেন না, রাজ্যভ্রষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত দ্যুমৎসেনের দরিদ্রা বধূ মনে করিলেন। আর এই মনে করিয়াই তিনি রত্নালঙ্কারাদি ফেলিয়া দিয়া বল্কলে আপন দেহের অতুলনীয়

সৌন্দর্য্য আবৃত করিয়া, দৃষ্টিহীন অন্নহীন অরণ্যবাসী শ্বশুরের ক্ষুদ্র কুটীরে ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য ফুটাইলেন। সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া দ্যুমৎসেন-বধূ যেন বলিলেন, ঘরে ঘরে যেন এইরূপ সৌন্দর্য্য ফুটে, সকল হিন্দুবধূ যেন এমনি সৌন্দর্য্য ফুটান। বড় দুঃখের বিষয়, অনেক হিন্দু-গৃহে এখন এমন সৌন্দর্য্য ফুটেনা—সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে কদর্য্যতাই দৃষ্ট হয়। এখন অনেক ধনীর মেয়ে নির্ধনের বধূ হইয়া পিতৃসম্পাদের গর্ব্বের আস্ফালনে দরিদ্র শ্বশুরের গৃহ অসুখ অশান্তি কলহাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে, শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করিয়া অতিশয় মনঃকষ্ট দেয়, শ্বশুরের অপর বধূদিগের মনে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত করে, দরিদ্র দাসদাসীদিগকে পর্য্যন্ত নিষ্ঠুররূপে নিগৃহীত করে। তাহারা আপন আপন স্বামীকে কুমন্ত্রণা দিয়া বা ভয় দেখাইয়া পিতৃমাতৃ-দ্রোহী করিয়া সহজেই শ্বশুরের গৃহ ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহাদের জন্য তাহাদের শ্বশুরের গৃহ নরকবৎ হইয়া পড়ে। দরিদ্রের বধূ হইলে ধনীর কন্যার শ্বশুরগৃহে বড় সাবধান হইয়া, বড় বিবেচনা করিয়া, দরিদ্রের কন্যার

ন্যায় আচরণ করিতে হয়, নহিলে কোপানলে, ঈর্ষানলে, দুঃখানলে শ্বশুরগৃহ অচিরে দগ্ধ হইয়া যায়। এদেশে পুত্রের পিতামাতা বধূর পিতামাতার নিকট কিছু বেশী সম্ভ্রম ও গৌরব পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, বধূর পিতা তাঁহাদের অপেক্ষা ধনবান বা সঙ্গতিশালী হইলে, কুটুম্ব যেন তাঁহাদের বেশ মনের মতন হয় না, বধূর পিতার আপন ধনের অথবা বধূর পিতৃধনের গর্ব্ব তাঁহাদের ভাল লাগে না। এই নিমিত্ত দরিদ্রের বধূ হইলে ধনীর মেয়ের শ্বশুরগৃহে দরিদ্রের মেয়ের ন্যায় আচরণ করাই কর্ত্তব্য। দরিদ্রের চারি পাঁচটী বধূর মধ্যে যেটী ধনীর মেয়ে সেটী অনেক সময় পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ শ্বশুরগৃহে স্বয়ং নানা প্রকারে ব্যয় করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করেন। শ্বশুর শ্বাশুড়ী কাহারো হাতে একটী পয়সা দিতে পারেন না, ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় ছট্ ফট্ করিলেও জায়েরা তাহাদিগকে একটী পয়সার খাবার কিনিয়া দিতে পারে না, আর তুমি বড় মানুষের মেয়ে,বাপের কাছে মাসহরা পাও, তুমি সেই অর্থে আত্মসেবা না করিয়া যদি কেবল ইহাকে এইটী কিনিয়া দিয়া বা উহাকে ঐটী কিনিয়া দিয়া

আপনার বাক্স হইতে তোমার বাপের বাড়ীর টাকা পয়সা বাহির করিয়া আনিয়া আপন হাতে দ্রব্যাদির মূল্য গণিয়া দেও, তাহা হইলেও ত তোমার ভাল কাজ করা হয় না। কিন্তু অনেকে এরূপ করায় কোন দোষ দেখেন না, বরং বউকে এইরূপে বাপের টাকা খরচ করিতে দেখিয়া যে সব শ্বাশুড়ী তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হন, তাঁহাদিগকেই দোষী বিবেচনা করেন। প্রায় বিশ বৎসর হইল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে 'মেজবউ' নামক একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি কুমারী মেরী কার্পেণ্টারগ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের চারিটী পুত্র ও দুই কন্যা। চারিটী পুত্রেরই বিবাহ হইয়াছে এবং বোধ হয় কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠাই বিবাহিতা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তাঁহার পুত্রবধূদিগের মধ্যে একমাত্র মধ্যমাই সঙ্গতিপন্ন লোকের মেয়ে। তাঁহার নাম প্রমদা। তিনি পিতার নিকট হইতে প্রতিমাসে দশটী করিয়া টাকা পান এবং সেই টাকাগুলি স্বহস্তে ব্যয় করেন। তিনি

মেয়ে ভাল। তাঁহার অপব্যয় কিছুই নাই। তথাপি তাঁহার শ্বাশুড়ী তাঁহারই উপর অধিক বিরক্ত। ইহার কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত একটী ঘটনায় লক্ষিত হয়। এক দিন এক বস্ত্রবিক্রেতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে বস্ত্র বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র, গোপাল, একখানি রাঙ্গা কাপড়ের জন্য বড়ই আব্দার আরম্ভ করিল। তাহার মাতা বা পিতামহীর বস্ত্র কিনিয়া দিবার ক্ষমতা ছিল না। "প্রমদা সর্ব্বাগ্রে গোপালকে একখানি রাঙ্গা কাপড় কিনিয়া দিলেন। সেই কাপড় পাওয়া, অমনি মেজ কাকার কোল হইতে নামা, আর গোপালকে রাখা ভার। নামিয়া কাপড় পরিয়া, কাচা কোঁচা দিয়া নবব্রহ্মচারীর ন্যায় পিতামহীর নিকট চলিল। প্রমদা ক্ষেমী এবং পুঁটীকেও এক এক খানা কাপড় লইতে বলিলেন। ইত্যবসরে সেজ বউ এবং (কর্ত্তার ছোট মেয়ে) বামাও উপস্থিত, কোন্ লজ্জায় তাহাদিগকে নিরাশ করেন, তাহাদের দুইজনকে দুইখানি বস্ত্র কিনিয়া দিলেন, এবং ছোট বউএর জন্যও একখানি নিলেন। * * প্রমদা বাক্স খুলিয়া ৮টী টাকা দোকানদারকে

দিলেন এবং গৃহকার্য্যে গমন করিলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী মনে মনে গর গর করিতে লাগিলেন।” কর্ত্রীঠাকুরাণীর ‘গর গর’ করিবারই ত কথা। কুটুম্বের টাকায় ছেলে, মেয়ে, বউ, নাতি, নাতিনী প্রভৃতির বস্ত্রাদি ক্রীত হয়, কোন বাঙ্গালী স্ত্রী বা পুরুষের এমন ইচ্ছা নয়। শ্বশুর শ্বাশুড়ী যতই দরিদ্র হউন, বধূর পিতার টাকায় আপনাদের অভাব মোচন করিতে ঘৃণা বোধ করেন; এইরূপে উপকৃত হওয়া হীনতা ও নীচতার পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করেন। কুটুম্বের অর্থে প্রতিপালিত হওয়া সম্বন্ধে এই যে ঘৃণার ভাব ও হীনতাজ্ঞান, ইহা যেমন সুফলপ্রদ তেমনি প্রশংসনীয়। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান লুপ্ত না হইলে কেহ কুটুম্বের প্রত্যাশী হইতে পারে না। কুটুম্বের প্রত্যাশী হওয়া আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান নাশের বা হ্রাসের প্রবল কারণ হইয়া থাকে। এই এক কথা। তাহার পর শ্বশুর শ্বাশুড়ী থাকিতে হিন্দুর পরিবারে বধূর কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করা রীতিবিরুদ্ধ, তাহাতে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অপমান হইয়া থাকে। সংসারের প্রয়োজনার্থ অর্থব্যয় কর্ত্তৃত্বের প্রধান কার্য্য বা অঙ্গ। বধূ ঐ অঙ্গে আঘাত করিলে, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অপমানেরও

যেমন একশেষ হয়, মনঃকষ্টেরও তেমনি সীমা থাকে না। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় এরূপ বুঝেন না। তিনি বলেন, বউ বাপের টাকা প্রমদার ন্যায় স্বয়ং ব্যয় করিলে বড় মহত্ত্বেরই কাজ করেন; আর সেই কাজ দেখিয়া বউয়ের উপর ক্রুদ্ধ হইলে শ্বাশুড়ীরই নীচতার পরিচয় দেওয়া হয়। বাটীতে আসিয়া যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নাতি নাতিনীগুলিকে নূতন কাপড়ের আহ্লাদে উন্মত্ত দেখিলেন, তখন গৃহিণীর সহিত তাঁহার এইরূপ কথোপকথন হইল—

"কর্ত্তা। দেখ দেখি কত আনন্দ, তোমার কি দেখে সুখ হচ্ছে না?

কর্ত্রী। তুমিই সুখ কর, আমি ঢের দেখেছি।

কর্ত্তা। কি বিপদ! তোমার কাছে কি কিছুতেই নিস্তার নাই; অপরাধটা হলো কি?

কর্ত্রী। মন্দ কি, আমি বড়মান্‌ষি ঢঙ দেখ্‌তে পারিনে।

কর্ত্তা। বড়মান্‌ষি ঢঙ কি দেখ্‌লে?

কর্ত্রী। তা বইকি, কেন না আমার বাপের টাকা আছে সকলে দেখুক্।

কর্ত্তা। কি বিপদ্, দোষটা কি হয়েছে? আমা-

দেরই কোথা কিনে দেওয়া উচিত, আমরা পারিনে, উনি বাপের বাড়ী হতে যে কয়টী টাকা পান তা এই রূপেই খরচ করেন, কোথায় এতে আনন্দিত হয়ে প্রশংসা করবে, না আবার রাগ, তোমার মত নীচ অন্তঃকরণ আমি দেখি নাই।”

প্রমদা মেয়ে মন্দ নয়, বাপের টাকায় ‘বড় মানষি’ করিবার অভিপ্রায় বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না! কিন্তু শ্বশুর শ্বাশুড়ী থাকিতে বাপের টাকা স্বয়ং ব্যয় করিয়া সে যে বিষম ভুল করিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। তাহার শ্বাশুড়ী তাহার উপর বড় অধিক মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভাল করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে অকারণে বা সামান্য কারণে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হন নাই, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কর্ত্তা মহাশয় তাঁহাকে নীচমনা বলিয়া ভৎ᾿সনা করিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তামহাশয়েরই বুঝা উচিত ছিল যে দরিদ্রতা বশতঃ অম্লানমুখে কুটুম্বের টাকা গ্রহণ করিয়া বা তদ্দারা আপন অভাব মোচন করিয়া আনন্দানুভব করিলে আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া নীচাশয়তা, পরপ্রত্যাশিতা এবং পরান্নপ্রিয়তা যেমন বর্দ্ধিত হয় আর কিছুতে

তেমন হয় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণীর অন্তঃকরণ নীচ নয়, তাঁহার আপনারই অন্তঃকরণ নীচ। বাপের টাকায় বধূর কর্ত্তৃত্ব আমাদের পরিবারে যে এত অসহনীয় হইয়া থাকে, ইহা আমাদের বড় সুলক্ষণ, কুলক্ষণ নয়। যে পরিবারে ঐরূপ কর্ত্তৃত্বে আপত্তির অভাব বা আহ্লাদ দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে যে সে পরিবারের অধঃপতন হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ও কনিষ্ঠা বধূ নিতান্ত নীচাশয়া না হইলে 'মেজ বউয়ের' প্রদত্ত বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিত না। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেজবউ' পিতার ধনে গর্ব্বিতা ছিলেন না; তিনি ভ্রমক্রমে পিতার প্রদত্ত অর্থ শ্বশুরগৃহে কর্ত্রীর স্বরূপ স্বয়ং ব্যয় করিতেন। তথাপি তাঁহার উপর তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী এত বিরক্ত হইতেন। এখন কিন্তু অনেক ধনবান বা সঙ্গতিশালী লোকের মেয়ে দরিদ্র শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর ভাসুর, দেবরপত্নী ভাসুরপত্নী প্রভৃতিকে বাপের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মনঃকষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে অতি উদ্ধতভাবে আপন আপন ইচ্ছামত বাপের টাকায় বড়মানুষী করিয়া থাকে। যে সকল

গৃহে বধূর এইরূপ আচরণ, সে সকল গৃহে সকলেই বধূর দ্বারা অপমানিত জ্ঞান করে, বধূর উপর সকলেই বিরক্ত হয়, বধূকে সকলেই ঘৃণা করে। সে সকল গৃহে সুখ, শান্তি, সদ্ভাব থাকিতে পারে না। তথায় বিদ্বেষবহ্নি এবং ক্রোধানল শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে। কলহে, বিদ্রূপে, টিট্‌কারিতে, রেষারেষিতে, দ্বেষাদ্বেষিতে সে সকল গৃহ দিবারাত্র নরকতুল্য হইয়া থাকে। তথায় দেবতা থাকিলেও অচিরে পিশাচ হইয়া পড়েন। সে সকল গৃহ ছারখার হইয়া যায়।

এই যে সকল মহানিষ্ট আমাদের মধ্যে ঘটিতেছে, এখনকার বাঙ্গালীর মেয়েদের বধূধর্ম্মের বিস্মৃতি তাহার একটী প্রধান কারণ। এই বিস্মৃতি উপস্থিত হইতেছে বলিয়া আদর্শবধূ সাবিত্রীর কথা স্মরণ করা আবশ্যক হইয়াছে। সাবিত্রী রাজ-রাজেশ্বরের কন্যা; তাঁহার পিতার অসীম ঐশ্বর্য্য। তেমন ঐশ্বর্য্য কোন বাঙ্গালীর মেয়ের বাপের নাই। কিন্তু আজিকার বাঙ্গালীর মেয়ে বাপের দুই চারিটা টাকার গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া দরিদ্র শ্বশুরের গৃহ ভাঙ্গিয়া উৎসন্ন করিয়া দিতেছে, আর রাজ-

রাজেশ্বর-দুহিতা সাবিত্রী রাজ্যভ্রষ্ট হীনাবস্থাপন্ন দ্যুমৎ-সেনের বধূ হইয়াই, পিতার মণিমুক্তাদিতে শোভিতা হইয়া থাকা নিতান্ত বিসদৃশ বুঝিয়া, সে সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করত, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাষায় বল্কল পরিধান করিয়া আপনাকে যেমন সুখী তেমনি চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে হয় যে দরিদ্রের বধূ হইলে স্ত্রীলোকের পিতার ঐশ্বর্য্যাদি ভুলিয়া গিয়া শ্বশুর গৃহে দরিদ্রের কন্যার ন্যায় দীন ভাবে বাস করা কর্ত্তব্য।

এখন আদর্শ বধূ সাবিত্রীর আর একটী কার্য্যের উল্লেখ আবশ্যক। সে কার্য্যটী তিনি পতি সত্যবানের সহিত বনে গিয়া করিয়াছিলেন। যম যখন তাঁহার পতিকে লইয়া যান তিনি তখন যমের পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে ধর্ম্ম কথা কহিতে থাকেন। যম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুটিকতক বর দেন। যম যখন তাঁহাকে প্রথম বর চাহিতে বলেন, তিনি তখন পিতার জন্য বর না চাহিয়া, অন্ধ শ্বশুরের জন্য চক্ষু ভিক্ষা করিলেন ঃ—

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদ্বনবাসমাশ্রিতো বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাশ্রমে।
স লব্ধচক্ষুর্বলবান ভবেন্নৃপস্তব প্রসাদাজ্জ্বলনার্কসন্নিভঃ॥

অর্থাৎ

আমার শ্বশুর স্বীয় রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বনবাস আশ্রয় করতঃ আশ্রমে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন; অতএব আমার প্রার্থনা এই যে আপনকার প্রসাদে সেই নরপতি নয়ন লাভ করতঃ বলবান্ এবং অগ্নি ও সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী হন।

যম যখন তাঁহাকে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন তখনও তিনি পিতার জন্য বর না চাহিয়া, রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তি ভিক্ষা করিলেন :—

হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ।
জহ্যাৎ স্বধর্ম্মান্ন চ মে গুরুর্যথা দ্বিতীয়মেতদ্বরয়ামি তে বরম্॥

অর্থাৎ

আমার ধীমান শ্বশুরের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে; অতএব আমার গুরু সেই নরপতি যেন পুনরায় নিজ রাজ্য লাভ করেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ না করেন, এই দ্বিতীয় বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি।

তাহার পর যম যখন তাঁহাকে তৃতীয় বর প্রার্থনা

করিতে বলিলেন তখন তিনি পিতার নিমিত্ত পুত্র প্রার্থনা করিলেন ঃ—

মমানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা ভবেৎ পিতুঃ পুত্রশতং তথৌরসম্ ।
কুলস্থ সন্তানকরঞ্চ যদ্ভবেৎ তৃতীয়মেতদ্বরয়ামি তে বরম্ ॥

অর্থাৎ

আমার পিতা ভূপতি অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন, অতএব কুলের সন্তানকর হইতে পারে, তাঁহার এরূপ এক শত ঔরস পুত্র হউক, এই তৃতীয় বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি ।

পিতার সহিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ ; শ্বশুরের সহিত বিবাহজনিত সম্বন্ধ। সুতরাং শ্বশুরের সহিত যে সম্বন্ধ পিতার সহিত তদপেক্ষা গাঢ়তর ও নিকটতর সম্বন্ধ। যাহার সহিত গাঢ়তর ও নিকটতর সম্বন্ধ মনের টান স্বভাবতঃ তাহার দিকেই প্রবলতর হইয়া থাকে। তথাপি সাবিত্রী প্রথম বর পিতার জন্য না চাহিয়া শ্বশুরের জন্য চাহিলেন, দ্বিতীয় বরও পিতার নিমিত্ত না চাহিয়া শ্বশুরের নিমিত্ত চাহিলেন। তাহার পর, শ্বশুরের নিমিত্ত যাহা প্রার্থনা করিবার অভিলাষ ছিল তাহা শেষ করিয়া তবে পিতার নিমিত্ত বর চাহিলেন। অর্থাৎ যাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক, গাঢ়তম ও

নিকটতম তাঁহার মঙ্গল কামনা অগ্রে না করিয়া, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ কেবল মাত্র বিবাহজনিত এবং গাঢ়ত্বে ও নৈকট্যে নিকৃষ্ট, সাবিত্রী অগ্রে তাঁহারই মঙ্গলকামনা করিলেন। ঐরূপ করিবার অর্থ এই যে সাবিত্রী শ্বশুরকে পিতারও উপরে আসন দিয়াছেন এবং পিতা অপেক্ষা অধিকতর আত্মীয়,বেশী আপনার মনে করিয়াছেন। বধূ হইলে সকল স্ত্রীলোকেরই পিতা অপেক্ষা শ্বশুরকে অধিকতর উচ্চপদাধিষ্ঠিত এবং অধিকতর আপনার মনে করিয়া বধূধর্ম্ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে বধূধর্ম্ম-পালনে বিষম ত্রুটী ঘটিয়া বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত দিয়া একথা বুঝাইবার প্রয়োজন আর নাই। এখনকার অনেক বাঙ্গালী বধূর পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া শ্বশুরের সংসার ছারখার করিবার যে কথা অব্যবহিত পূর্ব্বে কহিয়াছি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করা যাইতে পারে।

সাবিত্রীর যে কার্য্যের উল্লেখ করা হইল তাহাতে তাঁহার নিজের অসীম মহত্ত্ব এবং বধূধর্ম্মের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অতি পরিষ্কার রূপে পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। শ্বশুরকে পিতার অপেক্ষা বড় জ্ঞান

করা, পিতার অপেক্ষা আপনার মনে করা কত কঠিন তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধাতা যে পিতাকে সর্ব্বাপেক্ষা আপনার করিয়া দিয়াছেন, অপর এক ব্যক্তিকে সেই পিতা অপেক্ষা বেশী আপন ভাবিতে মনের কত বল, হৃদয়ের কত উদারতা ও প্রশস্ততা, চিত্তের কত নির্ম্মলতা আবশ্যক তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হয়? সকলেই বলিয়া থাকেন, পরকে আপন করার ন্যায় মহৎ কাজ আর নাই, পরকে আপন করা দেবতার কাজ। কিন্তু শ্বশুরকে পিতা অপেক্ষা আপন করা, এই যে কার্য্যটী, ইহা শুধু পরকে আপন করা নয়, ইহা পরকে আপন অপেক্ষা আপন করা, সুতরাং কত যে মহত্ত্বের কাজ মনে তাহার ধারণা হয় না। যে বধূধর্ম্ম রমণীকে পরকে আপন অপেক্ষা আপন করিতে উপদেশ দেয়, তাহার মাহাত্ম্যের সীমা নাই। স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধনপক্ষে তাহার উপযোগীতার এক শতাংশ উপযোগীতাও আর কিছুতে নাই। সেই বধূ-ধর্ম্ম আমাদের বলিয়া, এত অধঃপতন সত্ত্বেও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এখনও চরিত্রের অপূর্ব্ব মহত্ত্ব, উদারতা, পবিত্রতা এবং রমণীয়তা এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে

ঐ সকল গুণ কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। সাবিত্রী যে বধূ-ধর্ম্মের আদর্শ,আমাদের নবীনাদের মধ্যে অনেকের তাহা ভাল লাগে না, তাহা পালন করিতে তাঁহাদের কষ্ট বোধ হয়। ইহার ফল বড় বিষময় হইতেছে। আমাদের সুখের পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি উড়িয়া যাইতেছে, তজ্জন্য আমাদের ধনজ অহঙ্কার, অসূয়া, বিদ্বেষ প্রভৃতি বাড়িতেছে, আমাদের স্ত্রীচরিত্রের অবনতিতে পুরুষচরিত্রও হেয় হইয়া পড়িতেছে এবং আমাদের সন্তান সন্ততি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে। এই জন্য আমাদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই আমাদের বধূ-ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আদর্শ-বধূ সাবিত্রীর কথা কহিবার ন্যায় সেই বধূ-ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিবার প্রীতিপদ এবং সহজ উপায় আর নাই।

বধূ হইয়া সাবিত্রী শ্বশুরগৃহে যে যে কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, মহাভারতকার বিশেষ ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমনে চ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাদধে॥

শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্ব্বাচঃ সংযমনেন চ।
তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যেন শমেন চ।
রহঃশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ॥

অর্থাৎ।

পরিচর্য্যা, শীলসত্যাদিগুণাবলি, স্নেহ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান-দ্বারা সকলেরই তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তিনি আচ্ছা-দনাদি সর্ব্বপ্রকার শরীরসৎকার দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেব পূজার আয়োজন ও বাক্যসংযমন দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয় সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও নির্জনে পরিচর্য্যা দ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী দ্বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—(১) পতি-সেবা এবং (২) শ্বশুরশ্বশ্রূ ও অপর সর্ব্বজন সেবা। প্রথম কার্য্য, অর্থাৎ পতির তুষ্টিসাধন, সকল দেশের নারীই করিয়া থাকে; সুতরাং সকল দেশের নারী-চরিতেই ঐ কার্য্যের উল্লেখ থাকিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় কার্য্য, অর্থাৎ শ্বশুরশ্বশ্রূ প্রভৃতির তুষ্টিসাধন, হিন্দু নারীর যেরূপ অবশ্যকরণীয় কার্য্য, বোধ হয় পৃথিবীতে অপর কোন নারীরই সেরূপ নয়। সুতরাং এদেশ ভিন্ন অপর সকল দেশের নারীচরিতে ঐ

কার্য্যের উল্লেখ না থাকিতেও পারে, প্রায়ই থাকে না। অন্য দেশের নারী শ্বশুরশ্বশ্রূর সেবা করেন না, এমন কথা বলিতে পারি না, বোধ হয় অনেকে করেন। কিন্তু না করিলেও তাঁহাদের দোষ হয় না, তাঁহারা নিন্দনীয় হয়েন না। যে দেশের পারিবারিক প্রণালী এখানকার পারিবারিক প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তথায় বধূ শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির সহিত একত্রে বাস করেন না, সুতরাং তাঁহাদের সেবা তাঁহার অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত ও পরিগণিত হয় না। ভারতের যেরূপ পারিবারিক প্রণালী তাহাতে বধূ পতিকে লইয়া শ্বশুরশ্বশ্রূ প্রভৃতি হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে পারেন না, তাঁহাদের সহিত তাঁহাকে একত্রে বাস করিতে হয়। এই জন্য তাঁহাদের সেবা, পরিচর্য্যা, তুষ্টিসাধনাদি তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এ কর্ত্তব্য এমনি গুরুতর, পারিবারিক সুখ, শান্তি, শৃঙ্খলাদির নিমিত্ত ইহার পালন এতই প্রয়োজনীয় যে, ইহা কেবল নৈতিক কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হওয়া যথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই; হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় যে বেদ সেই বেদবিহিত যে মন্ত্রদ্বারা বিবাহ সিদ্ধ ও পতিপত্নীসম্বন্ধ স্থাপিত

হয় তাহাতেই ব্যবস্থিত হইয়াছে। স্থানান্তরে * এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্নীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়া সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের সম্বন্ধ হয় এইরূপ কামনা করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূং ভব।
ননন্দরিচ সাম্রাজ্ঞী ভব সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

বর কন্যাকে বলিতেছেনঃ—শ্বশুরে সাম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সাম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সাম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সাম্রাজ্ঞী হও।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে সাম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, কন্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন।

বিবাহ প্রক্রিয়ায় ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে বর নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পড়াইয়া কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইবে ঃ—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলোভূয়াসম্।

* হিন্দুত্ব, ২১০-১১ পৃষ্ঠা।

হে ধ্রুব নক্ষত্র! তুমি যেমন অচল আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

উভয় মন্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই যে, পতির পরিবারের সকলের সহিত পত্নীর সুখ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেন না, তাহা না হইলে তিনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর প্রভৃতি কাহারো প্রীতিপ্রদায়িনী এবং পতিকুলে অচলা হইতে পারেন না।

এরূপ আর কোন দেশে, আর কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া বোধ হয় না। অন্য দেশে বিবাহের মন্ত্রাদিতে পত্নীর কেবল মাত্র পতির সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের কথা থাকে। ভারতে বিবাহের মন্ত্রে পত্নীর কেবল পতির সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের কথা থাকে না, পতির পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির সম্বন্ধেও কর্ত্তব্যের কথা থাকে। অন্য নারী বিবাহসূত্রে কেবল পতিতে আবদ্ধ হন; হিন্দুনারী বিবাহসূত্রে কেবল পতি নয়, পতির পিতামাতা প্রভৃতিতেও আবদ্ধ হন; বিবাহের ফলে অন্য নারীর উপর কেবল পতির অধিকার হইয়া থাকে, হিন্দুনারীর উপর পতির এবং পতির পিতামাতা প্রভৃতিরও অধিকার হয়। হিন্দু

স্ত্রীর উপর শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির অধিকার কেবল যে বিবাহের মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত হয় তাহা নহে, কার্য্য-ক্ষেত্রেও স্বীকৃত হয়। সাবিত্রী যখন সেই কাল রাত্রিতে পতির সহিত বনে যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুনয় করিয়াছিলেন, সত্যবান্ তখন তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন ঃ—

যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
মম ত্বামন্ত্রয় গুরু ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্॥

অর্থাৎ

যদি গমনে তোমার উৎসাহ হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার এই প্রিয় কার্য্য করিব; কিন্তু এই দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে এ জন্য তুমি আমার জনক জননীর অনুমতি গ্রহণ কর।

বধূ যে গৃহের সকলেরই সম্পত্তি কেবল পতির নহেন, এ সংস্কার এখনও এদেশে অনেক স্থলে আছে এবং এখনও অনেক স্থলে বধূকে সমস্ত গৃহস্থের বধূ স্বরূপ কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। দশ জনের সহিত কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হইয়া দশ জনের প্রীতি ও মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হইতে হইলে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীল

হইতে হয়, স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতার অনুশীলন করিতে হয়, বিলাসবিমুখ হইয়া সংযমী মিতাচারী জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়, ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া প্রভৃতি মহদ্‌গুণের আধার স্বরূপ হইতে হয়। এই জন্যই স্বাধীন স্বতন্ত্র না থাকিয়া, দশ জনের সেবক সেবিকা, শুভকারী শুভকারিণী হইয়া থাকিলে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই স্বভাব বিশুদ্ধ, চরিত্র দেবতুল্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই এদেশে এখনও অনেক দেবতুল্য নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়। নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, পূর্ব্বে আরো অনেক দেখা যাইত। এই বধূটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এই বধূটী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, এই বধূটী যেন দ্রৌপদী—বধূর এরূপ প্রশংসা এদেশে ভিন্ন অন্য কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না, শুনিতে পাইবার উপায় নাই। যে বধূ কেবল পতিতে আবদ্ধ, হিন্দু বধূর ন্যায় পতির পিতামাতা, ভাই ভগিনী প্রভৃতিতে আবদ্ধ নহেন, এরূপ প্রশংসায় তাঁহাকে বঞ্চিত হইতেই হয়। বধূ যেখানে দশজনের হইয়া দশজনের সেবায় প্রাণপাত করেন, দশজনের ভোগসুখেই আপন ভোগসুখ অনুভব করেন, দশজনের শুভাশুভই

আপন শুভাশুভ মনে করেন, কেবল সেইখানে দশজনে 'বধূটী লক্ষ্মী' 'বধূটী দ্রৌপদী' 'বধূটী অন্নপূর্ণা' বলিয়া দশজনের কাছে দশমুখে তাঁহার স্তুতিবাদ এবং খ্যাতি ঘোষণা করেন। বধূচরিত্রের এমন দেবোপম মহত্ত্ব এবং বধূর এমন দেবতুল্য প্রতিষ্ঠা অন্যত্র অসম্ভব। বধূচরিত্রের সেই দেবোপম মহত্ত্ব এবং বধূর সেই দেবতুল্য প্রতিষ্ঠা একমাত্র ভারতের বিবাহ প্রণালী ও পারিবারিক প্রণালীর ফল। ভারতের বিবাহপ্রণালী সমন্বিত ভারতের একান্নবর্ত্তী পরিবারের ন্যায় নরনারী চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধনক্ষেত্র আর নাই। পরিবারবদ্ধ হইয়া থাকা চরিত্রের উৎকর্ষসাধন জন্য যে নিতান্ত আবশ্যক, ইউরোপের বিচক্ষণ লোকেও তাহা একটু একটু বুঝেন। তাঁহাদেরই মধ্যে একব্যক্তি এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"From a selfish point of view, as well as in obedience to the higher motives, we should learn to cultivate the domestic affections; and, happily, this cultivation is the complete safeguard against selfishness. If we begin by thinking of our own happiness we shall

end by thinking of the happiness of others. We are justified, therefore, in speaking * * * of the family as an educational agency, a help to, and a mode of, self-culture. For the first condition of home happiness is that each member should practise self-restraint."

এস্থলে পরিবারকে যে প্রকৃতি ও প্রণালীর ধর্ম্ম-সাধনক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা বড় উচ্চ নহে বটে, তথাপি আজিকার স্বতন্ত্রবাসপ্রিয়তার দিনে এ মতটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

হিন্দু বধূ শুধু আপন পতির নহেন; পতির সমস্ত পরিবারের,—এই প্রাচীন সংস্কার এখন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। অনেক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীও সংস্কারটীকে অতিশয় ভ্রান্ত মনে করেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, খুল্লতাত প্রভৃতির সহিত একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকা তাঁহাদের যেমন অপ্রীতিকর, পত্নীর শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির অধীন হইয়া থাকাও তাঁহাদের তেমনই অপ্রীতিকর। অধিকতর দুঃখের বিষয়, অনেক বাঙ্গালী বধূও এখন পতিকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকিবারই পক্ষপাতিনী, শ্বশুর শ্বশ্রূর প্রতি হতশ্রদ্ধ, দেবর প্রভৃতির সম্বন্ধে নির্ম্মম। ইহাঁদের মনে স্নেহ, ভক্তি, নম্রতা, প্রভৃতি হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব

সকল আর স্থান পায় না; তৎপরিবর্ত্তে ঔদ্ধত্য, বিলাস বাসনা, ভোগ লালসা, অহঙ্কার, অসূয়া প্রভৃতি নীচ ও নিকৃষ্ট ভাব সকল প্রবল হইতেছে। অনেক স্থলে ইহাঁদেরই জন্য এখন শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও অপমানিত হইতেছেন এবং শ্বশুরগৃহ নরকতুল্য হইয়া উঠিতেছে, একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে এই কারণেই গৃহের সুখশান্তি চলিয়া যাই-তেছে এবং নরনারী উভয়েরই স্বভাবপ্রকৃতি নীচ এবং চরিত্র হেয় হইয়া পড়িতেছে। যে সমাজে নরনারীর মতিপ্রবৃত্তি জঘন্য হইতে থাকে, সে সমাজের অবস্থা ভবিষ্যতে ভয়াবহ হইয়া থাকে। যাহাতে আমাদিগকে সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় উপনীত হইতে না হয়, এই আশায় আজিকার বাঙ্গালী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই সমভাবে, এবং আজিকার বাঙ্গালী বধূকে বিশেষভাবে, আদর্শ-বধূ সাবিত্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

MAHARAJAH'S LIBRARY
20 NOV 1900

চতুর্থ অধ্যায়।

সাবিত্রীর পাতিব্রত্য।

মহাভারতকার সাবিত্রীর কথা পতিব্রতার কথা-স্বরূপ কহিয়াছেন।

অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্দৃষ্টপূর্ব্বাথ বা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা॥

অর্থাৎ—এই দ্রুপদ-দুহিতার ন্যায় পতিব্রতা ও মহাভাগা অন্য কোন সীমন্তিনীকে আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

সুতরাং সাবিত্রীর কথা পাতিব্রত্যের উদাহরণ। পাতিব্রত্য বলিতে কি বুঝায়?

হিন্দুপত্নীর গুণবর্ণনায় তিনটী শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে—সতীত্ব, পতিপ্রেম, পাতিব্রত্য।

তিনটি শব্দ একার্থবোধক নয়। যে স্ত্রী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সম্ভোগেচ্ছা করেন না, তিনি সতী। সতী স্ত্রী বলিতে এখন সাধারণতঃ এইরূপ স্ত্রীই বুঝায়। যে স্ত্রী পতিকে ভালভাসেন, তিনি পতি-প্রেমিকা। পতিপ্রেমিকাও সতী, কারণ পতিকে ভালবাসিলে, মনে পরপুরুষসম্ভোগের স্পৃহা জন্মিতে পারে না। পরপুরুষে স্পৃহাশূন্য অথচ পতিকে ভালবাসেন না, এমন অনেক স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পতিকে ভালবাসেন, অথচ পরপুরুষ-প্রিয়, এমন স্ত্রী নাই। সতী পতিপ্রেমিকা না হইতেও পারেন,কিন্তু পতিপ্রেমিকা সতী হইবেনই। সতীত্ব পতিপ্রেমের অন্তর্নিবিষ্ট, কিন্তু পতিপ্রেম সতীত্বের অন্তর্নিবিষ্ট নয়। পতিপ্রেমে যেমন সতীত্বও বুঝায়, পাতিব্রত্যে তেমনি সতীত্ব, পতি-প্রেম এবং আরো কিছু বুঝায়। পাতিব্রত্যের অর্থ পতিব্রতার ধর্ম্ম। যে স্ত্রী পতিকে আপন ব্রতস্বরূপ করেন, অর্থাৎ পতির সেবা, পতির প্রিয়সাধন, পতির অনুসরণ, পতির সহিত ধর্ম্মচর্য্যা শাস্ত্রবিহিত ব্রত-পালনের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, তদুদ্দেশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া জীবনোৎসর্গ করেন, তিনিই পতিব্রতা।

পতিপ্রেমের অর্থ পতির প্রতি ভালবাসা। ভালবাসা হৃদয়ের একটি ভাবমাত্র। উহাতে কার্য্য বুঝায় না; পাতিব্রত্য কার্য্যসাপেক্ষ। বিনা কার্য্যে পাতিব্রত্যের পরিচয় নাই। পাতিব্রত্য পতিপ্রেমমূলক, সন্দেহ নাই। যেখানে পতিপ্রেম নাই, সেখানে পাতিব্রত্যও নাই। কিন্তু যেখানে পতিপ্রেম আছে, সেখানে পাতিব্রত্য থাকিবেই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। পাতিব্রত্যে পতিপ্রেম আছে এবং আর একটি বস্তু আছে। পত্নীর পারলৌকিক মঙ্গলসাধনের একমাত্র উপায় পতি, এই জ্ঞান এবং এই জ্ঞানমূলক কার্য্য সেই বস্তু।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥—মনু, অধ্যায়, ১৫৫।

অর্থাৎ—স্ত্রীলোকদিগের স্বামী ব্যতীত যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন ব্রত নাই, উপবাস নাই, কেবল স্বামীর সেবা দ্বারাই স্ত্রী স্বর্গলোকে গমন করে।

এ জ্ঞানের মূল ধর্ম্মে। পত্নীর ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায় পতি, এ শিক্ষা ও ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্ম্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মে আছে। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের ভিত্তি পতিপ্রেমে এবং ধর্ম্মে বা আধ্যা-

ত্মিকতায়। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের অনুরূপ জিনিস অন্য কোন নারীতে নাই, থাকিতে পারেও না। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য, পার্থিব ভাব এবং আধ্যাত্মিক ভাবের অপূর্ব্ব এবং অত্যাশ্চর্য্য সম্মিলন ও সংমিশ্রণ। পতির সম্বন্ধে ঐ দুই ভাবের সম্মিলন ও সংমিশ্রণ, অন্য কোন নারীতে নাই। সতীত্ব, পতিপ্রেম, পাতিব্রত্য—এই তিনটি শব্দের মধ্যে প্রথমটির অর্থ সঙ্কীর্ণতম, দ্বিতীয়টির অর্থ তদপেক্ষা প্রশস্ত, এবং তৃতীয়টির অর্থ প্রশস্ততম। সতীত্ব নারীর মহৎ গুণ, পতিপ্রেম তাঁহার মহত্তর গুণ, পাতিব্রত্য তাঁহার মহত্তম গুণ। পাতিব্রত্যে সতীত্ব এবং পতিপ্রেম ত আছেই, তাহা ছাড়া আরো কিছু আছে। সাবিত্রী পতিব্রতা। তাঁহার সতীত্বের প্রকৃতি দেখুন।

সতীত্বের সাধারণ অর্থ, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে আসক্তি, অনুরাগ বা স্পৃহার অভাব। সাবিত্রীর সতীত্ব ইহা অপেক্ষাও কঠোরতর। তাঁহার যখন বিবাহও হয় নাই, তিনি যখন কাহারও পত্নী হন নাই, তখনও তিনি সতীত্বের যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অলোকসামান্য। সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া আসিলে পর, তাঁহার পিতা

যখন তাঁহাকে অন্য বর অন্বেষণ করিতে বলিলেন, তখন তিনি দৃঢ়তাসহকারে উত্তর করিয়াছিলেন—

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ু সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যাহম্।
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

অর্থাৎ—আমি একবার যাঁহারে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারিব না। দেখুন, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং পরিশেষে কর্ম্ম দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।

প্রকৃত কথাও তাই। পরের দ্রব্য বিনানুমতিতে গ্রহণ করিলেই যে চুরি করা হয় তাহা নহে, বিনানুমতিতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলেই চুরি করা হয়। পাপের উৎপত্তি মনে, মনে পাপচিন্তার উদয় হইলেই পাপ করা হয়; পাপের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ করা হয় না, এমন নহে। যে নারী পরপুরুষ

সম্ভোগ করে না, কিন্তু পরপুরুষসম্ভোগের অভিলাষিণী, সে অসতী। পাপ মনে, অনুষ্ঠানে নয়। সকল শাস্ত্রেরই এই কথা। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart" (মেথিউ—৫, ২৮)। ইহা পুরুষ সম্বন্ধে কথা বটে। কিন্তু স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এরূপ নীতি স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই এক, ভিন্ন নয়। যে নারী পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের অভিলাষিণী, তিনি সতী নহেন, অসতী। তিনি বিবাহিতা, বিবাহসূত্রে পতিলাভ করিয়াছেন, এক জনের পত্নী হইয়াছেন, সুতরাং অন্য পুরুষের কল্পনা করিলে তিনি ত অসতী হইবেনই। কিন্তু সাবিত্রী যখন পিতার আদেশে অন্য বর অন্বেষণ করিতে অস্বীকার করেন, তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, বিবাহসূত্রে সত্যবান তাঁহার পতি হয়েন নাই, কেবল মনে করিয়াছেন—সত্যবান আমার পতি। তথাপি তিনি সত্যবান ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করা নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপাচরণ মনে করিয়াছিলেন। মনই যদি পাপের হেতু হয়, পাপের অনুষ্ঠান না হইলেও, অর্থাৎ পাপকার্য্য

কৃত না হইলেও, যদি পাপ হইতে পারে, তাহা হইলে সাবিত্রী যাহা মনে বুঝিয়াছিলেন, সাবিত্রী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। কিন্তু এত দূর কে মনে করে, এমন কথা কয় জনে বলে? যে সকল সমাজে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, তথায় বিবাহের পূর্ব্বে অনেক রমণী যে এক বা একাধিক পুরুষের অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে, বোধ হয়, সন্দেহ হইতে পারে না। সেই সকল সমাজের সাহিত্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় যে তথায় কোন রমণী কোন পুরুষের অভিলাষিণী হইবার পর অন্য পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করা পাপ মনে করেন না। কিন্তু পাপ যে তাঁহাদের হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, সাবিত্রী যে সতীত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অসাধারণ সতীত্ব, অলোকসামান্য সতীত্ব; বোধ হয় ভারত ভিন্ন অপর সর্ব্বত্র অননুষ্ঠেয়, কল্পনাতীত সতীত্ব। সাবিত্রীর সতীত্বের তুলনা নাই। অমন কঠোর, অমন বিশুদ্ধ সতীত্ব তাঁহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর বোধ হয় তিনি যে রমণীকুলের সম্রাজ্ঞী, যে রমণীকুল পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী

হইবার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারই ব্রত উদ্‌যাপন করে, তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া সহজ নয়।

পতিপ্রেম ব্যতীত পাতিব্রত্য অসম্ভব। কিন্তু মহাভারতে সাবিত্রীকে প্রেমিকারূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাবিত্রী সত্যবানকে আপন প্রেমের গভীরতার কথা বলিতেছেন, প্রেমোচ্ছ্বাসে পাগল করিয়া দিতেছেন, দীর্ঘনিশ্বাসে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন, আলিঙ্গনের আতিশয্যে নিপীড়িত করিতেছেন, সাবিত্রীর-উপাখ্যানে মহাভারতের মহাকবি এরূপ কিছুই লেখেন নাই। ফল কথা, মহাভারতের মহাকবি যে জাতীয় কবি, তাঁহাদের অনেকেই ওরূপ করিয়া প্রেমবর্ণনা করেন নাই। ওরূপ প্রেমবর্ণনা যেন তাঁহাদের অননুমোদিত ছিল, অসার অপ্রকৃত জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বাল্মীকির মহাগ্রন্থ পড়িতে পড়িতে সীতার পতিপ্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু অত বড় গ্রন্থখানার মধ্যে কোথাও দেখি না, সীতা রামচন্দ্রকে আপন প্রেম-বিহ্বলতার কথা বলিতেছেন, প্রেমাশ্রুতে রামচন্দ্রের বিশাল বক্ষ ভাসাইয়া দিতে-

ছেন, রামচন্দ্রের প্রেমবিস্ফারিত নয়নে আপন প্রেমবিস্ফারিত নয়ন মিলাইয়া বিশ্বের আদর্শ প্রেমিকার ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া বসিয়া আছেন, রামচন্দ্রের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, আর রামচন্দ্র তাঁহার ব্রীড়াবনত মুখখানিতে চুম্বনবৃষ্টি করিতেছেন। রামায়ণ প্রেমকাব্য নয়, তাহাতে প্রেমের বর্ণনা না থাকিতেও পারে। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রেম-কাব্য—পৃথিবীর প্রেমকাব্যের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ-তম। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলের মহাকবির প্রেম-বর্ণনাও এ প্রণালীর নহে। গভীর প্রেমে চঞ্চলতা নাই, চপলতা নাই, বাচালতা নাই, অধৈর্য্য অস্থিরতা নাই—গভীর প্রেমে সহজে ঢেউ উঠে না, উহা অগাধ সলিলরাশির ন্যায় স্থির গম্ভীর। গভীর প্রেম উগ্র, উৎ-কট, উত্তপ্ত নয়। উহা স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, সুশীতল। প্রাচীন আর্য্য কবিদিগের কাব্যে প্রেমের এই মূর্ত্তিই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার পতি-পত্নীর প্রেম এই প্রকৃতির হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে যে হাস্য-পরিহাস, রঙ্গরসাদি হইত না, এমন নহে। হইত বৈ কি। কিন্তু মহাকবিরা প্রেমের সেরূপ খেলাকে প্রেমের সারাংশ মনে করিতেন না। প্রেমের সেরূপ

খেলাকে তাঁহারা লুকাইয়া রাখিতেন। প্রেমের যে খেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে হইয়া থাকে, সে খেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই তাঁহারা মহাপ্রকৃতির নিয়মসঙ্গত মনে করিতেন। শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া দুষ্মন্ত দিনকতক মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে ছিলেন। তাহার পর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। কিছু-দিন পরে শকুন্তলা তাঁহার নিকট আসিলেন, কিন্তু তিনি শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না এবং আপন পরিণীতা পত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন না। শকুন্তলা বিভ্রাটে পড়িয়া পতিকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সেই আশ্রমবাসময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন —একদিন আমরা উভয়ে নবমল্লিকা-মণ্ডপে বসিয়া-ছিলাম, আপনার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোঙায় জল ছিল, তৎকালে আমার কৃত্রিমপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে সেই হরিণশিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তবে অগ্রে জলপান করুক, ইহা বলিয়া আপনি স্নেহভরে তাহাকে নিকটে ডাকিলেন, কিন্তু সে অচেনা বলিয়া আপনার নিকট আসিল না। অনন্তর সেই জল আমি গ্রহণ করিলে, সে আসিয়া পান করিল। আপনি তাহাতে

উপহাস করিয়া বলিলেন, সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করে, তোমরা দুইজনেই জঙ্গলা কি না।

মহাকবি কিন্তু এ দৃশ্য আমাদিগকে দেখান নাই। পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া শকুন্তলা স্বয়ং এই কথা না বলিলে আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতাম না। মহাভারতের মহাকবিও লিখিয়াছেন, সাবিত্রী—

——প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ॥

অর্থাৎ—প্রিয় সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও নির্জ্জনে পরিচর্য্যা দ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—আর নয়। গভীর প্রেমের প্রকৃতিও তাই। গভীর প্রেমের লঘু খেলা স্বভাবতই কিছু কম এবং গোপনেই খেলান হয়। মহাকবিরা প্রেমের গভীরতাদি চিত্রিত করিবার নিমিত্ত ওরূপ খেলার বর্ণনা আবশ্যক মনে করিতেন না, অসমীচীন, অস্বাভাবিক ও শিষ্টতাবিরুদ্ধ বিবেচনা করিতেন। ওরূপ খেলা না দেখাইয়াও তাঁহারা প্রেমের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, মানব সাহিত্যে

তাহা অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। মহাভারতের মহাকবি সাবিত্রীর পতিপ্রেমের কি অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন।

পতির বিধাতৃবিহিত মৃত্যু নিবারণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়া সাবিত্রী ব্রতানন্দিনী হইয়া তিন দিন অনশনে থাকিয়া পতির সহিত মহারণ্যে গমন করিলেন। তথায় পতিপ্রাণার কোলে শুইয়াই পতি মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। স্বয়ং যম মৃত পতিকে লইতে আসিলেন; পতিব্রতা অমানুষিক চেষ্টায় পতিকে যমের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। তখন তাঁহার অনশনক্লিষ্ট দেহে ক্লান্তি আসিল, প্রতিজ্ঞাজনিত নির্ভীকতা চলিয়া গেল, মহারণ্যের ভীষণতা দেখিয়া তিনি ভীতা হইয়া পড়িলেন।

নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রূরাভিভাষিণঃ।
শ্রূয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ মৃগাণাঞ্চরতাং বনে॥
এতান্ ঘোরান্ শিবানাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
আস্থায় বিরুবন্ত্যগ্রাঃ কম্পয়ন্তো মনো মম॥

অর্থাৎ—এই নিষ্ঠুরনিনাদকারী নিশাচর সমস্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে এবং বনচারী মৃগ সকলের পদসঞ্চারে পত্রশব্দ সমস্ত শ্রুত হইতেছে।

উগ্রমূর্ত্তি শিবা সকল দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া এই ঘোর নিনাদ সমস্ত বিস্তার করিতেছে; ইহাতে আমার মন যে কম্পিত হইতেছে।

ভীতা হইয়া সাবিত্রী পতিকে বলিলেন;—

অস্মিন্নদ্য বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধম্যমানোঽত্র দৃশ্যতেঽগ্নিঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥
ততোঽগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্ব্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি সন্তীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ॥
যদি নোৎসহসে গন্তুং সরুজং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জ্ঞাস্যসি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে॥
শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদিতেঽনঘ॥

অর্থাৎ—হে অনঘ! আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যথিত দেখিতেছি; বিশেষতঃ অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হওয়াতে আপনি পথ জানিতে পারিবেন না; অতএব যদি গমন করিতে উৎসাহ না করেন, তবে কল্য প্রভাতে বন দৃষ্ট হইলে আপনকার অনুমতিক্রমে উভয়ে গমন করিব; সংপ্রতি আপনকার ইচ্ছা হইলে একরাত্রি এই স্থানেই বাস করি। অদ্য এই বন দগ্ধ হওয়াতে একটা শুষ্কবৃক্ষ জলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে; উহার কোন কোন স্থানে অগ্নি বায়ু দ্বারা

দীপ্যমান হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। আমি ঐ বৃক্ষ হইতে অগ্নি আনিয়া সর্ব্বদিকে প্রজ্বালিত করিব; এখানে এই কাষ্ঠ সমস্ত রহিয়াছে; অতএব আপনার সন্তাপ দূর করুন।

সত্যবানের প্রাণ কিন্তু তখন পিতামাতার নিমিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পতিব্রতাকে বলিলেন, "সন্ধ্যা না হইতেই মাতা আমারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন, আমি দিবসে বহির্গত হইলেও আমার জনক-জননী সন্তাপ করেন, আমার পিতা আশ্রমবাসীদিগের সঙ্গে আমারে অন্বেষণ করিতে থাকেন। * * * হে সাবিত্রী! আমার মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ; আমি একমাত্র তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ রহিয়াছি; অতএব রাত্রিকালে আমারে না দেখিলে তাঁহারা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন।" এই সকল কথা বলিয়া সত্যবান "বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।" কিন্তু সাবিত্রী ধর্ম্মরূপিণী, স্বামীর অশ্রু মুছাইয়া তখনও বলিলেন—

যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি।
শ্বশ্রূশ্বশুরভর্তৃণাং মম পুণ্যাস্তু শর্ব্বরী॥

ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বাং বৈ স্বৈরেষ্বপ্যনৃতাং গিরম্।
তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম॥

অর্থাৎ—যদি আমার তপস্যা দান বা হোম করা থাকে, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে এই শর্ব্বরী কল্যাণকরী হউক। পূর্ব্বে আমি পরিহাস স্থলেও কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এরূপ স্মরণ হয় না; সেই সত্য দ্বারা আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অদ্য জীবিত থাকুন।

ধর্ম্মরূপিণীর ধর্ম্মবলে এমনি বিশ্বাস; অধিকন্তু যমের নিকট শ্বশুর শ্বশ্রূর নিমিত্ত যেরূপ বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ধ্রুব জানিতেন যে, পতি সে রাত্রে পিতামাতার নিকট প্রত্যাগমন না করিলেও তাঁহাদের অনিষ্ট বা অমঙ্গল ঘটিবে না। কিন্তু পতি যখন পুনরায় বলিলেন—

কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্য্যাহি সাবিত্রী মা চিরম্।
পুরা মাতুঃ পিতুর্ব্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে সত্যেনাত্মানমালভে॥
যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্ম্মাঞ্চেজ্জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমন্তিকাৎ॥

অর্থাৎ—সাবিত্রী! আমি জনক-জননীর দর্শন কামনা করিতেছি; অতএব চল আর বিলম্ব করিও

না। হে বরারোহে! আমি আত্মস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতেছি, যদি মাতা বা পিতার অমঙ্গল ঘটনা দেখি, তবে কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিব না। অতএব যদি ধর্ম্মে তোমার মতি থাকে, যদি আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাসিণী হও, অথবা আমার প্রিয় কার্য্য করা তোমার যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে চল অবিলম্বে আশ্রমে গমন করি।

আপন প্রাণের আশঙ্কার কথা বলিয়া এবং পত্নীর ধর্ম্মের নাম করিয়া সত্যবান যেমন সাবিত্রীর পতি-প্রেম ও পাতিব্রত্য দুইয়ের প্রতি কটাক্ষ করিলেন, অমনি বৎসরব্যাপী চিন্তায় জর্জ্জরিতা, তিন দিনের অনশনক্লিষ্টা কাষ্ঠপুত্তলিকারূপে পরিণতা* সাবিত্রী উঠিয়া আলুলায়িত কেশরাশি বন্ধন করিয়া স্বামীকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইলেন, এবং স্বামীর বাম হস্ত আপন বামস্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া 'দক্ষিণ স্কন্ধ দ্বারা তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া' ভীতি ক্লান্তি সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া, সেই নিবিড়তিমিরাচ্ছন্ন

---

* এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ।
তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে॥

মহামনা দ্যুমৎসেন এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং সাবিত্রীও উপবাস করত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

হিংস্রজন্তুসমাকুল ভীষণ অরণ্য ভেদ করিয়া রাত্রি মধ্যেই পতিকে শ্বশুর শ্বশ্রূর নিকট লইয়া গেলেন*। জগতে পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব চিত্র রহিয়া গেল।

আমাদের মহাকবিরা এই রকম করিয়াই প্রেম চিত্রিত করিতেন। সে সকল চিত্রও হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া অঙ্কিত হইয়া পড়ে। এখনকার কবিনামপ্রাপ্ত অনেক বাঙ্গালী লেখকের প্রেমচিত্র অন্যরূপ দেখা যায়। সে চিত্রে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের আস্ফালন, আড়ম্বর, বক্তৃতা, গবেষণা, হাহুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, চুম্বন ও আলিঙ্গন ভিন্ন আর বড় একটা কিছু থাকে না। প্রেমের কার্য্যাদি যাহা বর্ণিত হয়, তাহাও যেন প্রেমের অভিনয়বৎ, মাত্রায় বড়

---

* কাশীরাম সাবিত্রী ও সত্যবানকে সেই রাত্রিটা একটা গাছে চড়াইয়া রাখিয়াছেন :—

অকারণে করহ গমন মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিবা পথ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোনমতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার মম এই নিবেদন॥
সত্যবান বলে প্রিয়ে উত্তম কহিলে।
ইহা না করিলে কোথা যাব রাত্রিকালে॥
ইহা বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে॥

বেশী চড়া, প্রকৃতিতে নিতান্ত অস্বাভাবিক। তাঁহারা প্রকৃত প্রেমের সহিত অপরিচিত, প্রেমতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাই তাঁহাদের প্রেমচিত্র এত বিকৃত, বিসদৃশ, অপ্রকৃত ও লঘুত্বপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রেমের প্রকৃতিই এই যে, প্রেমিকের যাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র, প্রেমিকারও তাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন; প্রেমিকের যাঁহারা স্নেহ, দয়া বা কৃপার পাত্র, প্রেমিকারও তাঁহারা স্নেহ, দয়া বা কৃপার পাত্র হইয়া থাকেন। হৃদয়ের পূর্ণ মিলনেই পূর্ণ ও প্রকৃত প্রেম। পতির হৃদয় যেখানে যেখানে, পত্নীর হৃদয়ও যদি সেইখানে সেইখানে থাকে, তবেই বুঝিতে হয় যে, পত্নীর পতিপ্রেম অবিকৃত ও বিশুদ্ধ। সত্যবানের চক্ষে পিতামাতা কি বস্তু, তাহা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। তিনি যে দয়ালু, দানশীল এবং মিত্রবৎসল, নারদ কর্ত্তৃক তাঁহার চরিত্রবর্ণনায় তাহাও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত—সাংকৃতে রন্তিদেবস্য স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ (সত্যবান স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করিতে সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের তুল্য); সমৈত্রঃ (তিনি মিত্রবৎসল)। সাবিত্রী এ হেন পতির পিতা মাতা প্রভৃতির কত ভক্তিপ্রীতিসহ-

কারে, কত প্রাণপণে সেবা করিতেন,তাহা সাবিত্রীর উপাখ্যানেই লিখিত আছে—

পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েন দমেন চ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাদধে॥
শ্বশ্রূং শরীরসংকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসংকারৈর্ব্বাচঃ সংযমনেন চ॥

পতির প্রিয় ব্যক্তি যে পত্নীর প্রিয়, তিনিই যথার্থ পতিপ্রেমিকা; যে পত্নী পতির প্রিয় ব্যক্তির সেবা করেন, তিনিই যথার্থ পতির সেবিকা। এই রূপ পত্নীই প্রকৃত পক্ষে পতিব্রতা। যে রমণী পতির পিতা মাতা প্রভৃতিকে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা অনাদর বা অযত্ন করেন, তিনি পতিকে লইয়া থাকিলেও, পতিব্রতাও নহেন, পতিপ্রেমিকাও নহেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গে এখন এইরূপ নারীর সংখ্যাই বাড়িয়া যাইতেছে।

এইবার মায়ের মৃতপতিকে পুনর্জীবিত করাইবার সেই ত্রিলোকবিস্ময়কর কথা কহিতে হইবে। সে কথার মাহাত্ম্য, বিশালতা, অপূর্ব্বত্ব, অলৌকিকতার ধারণা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। সে কথা কহিবার মতন করিয়া কহিতে পারি, এমন ভাগ্য করিয়া আসি নাই। তথাপি সে কথা না

কহিলে নয়। সাবিত্রীকথার তাহাই চরম কথা। সে কথা কহিব। কহিতে ভয় কি? মায়ের কথা যেমন করিয়াই কহা যাউক, অপরাধ হয় না।

সত্যবানকে পতিরূপে মনোনীত করিয়া আসিয়াই সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের নিকট শুনিলেন যে, ঠিক এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু অবধারিত। এই বিষম কথা শুনিয়াও সাবিত্রী সত্যবানকে পতি করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। সত্যবানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তিনি শ্বশুরগৃহে থাকিয়া সেই বিষম কথা ভাবিতে লাগিলেন। দিন গণিতে গণিতে সেই ভীষণ দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আর তিন দিন মাত্র আছে। সাবিত্রী অনশনব্রত অবলম্বন করিলেন। চতুর্থ দিবসে স্বামীর পরলোকগমন হইবে। তিনি—

ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাভবৎ—

'ত্রিরাত্র-ব্রত উদ্দেশ করিয়া দিবানিশি উপবাস করিতে' লাগিলেন। সঙ্কল্প—স্বামীকে পরলোকগমন করিতে দিব না। তাঁহার ব্রতের কথা শুনিয়া শ্বশুর দ্যুমৎসেন মহাচিন্তাকুল হইয়া বলিলেন—মা,

তুমি বড় কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিতে পারিবে না।

অতিতীব্রোঽয়মারম্ভস্ত্বয়ারব্ধো নৃপাত্মজে।
তিসৃণাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্॥

শ্বশুরকে কাতর দেখিয়া তিনি বলিলেন—পিতা, আপনি কাতর হইবেন না, আমি ব্রত উদ্যাপন করিতে পারিব। নিশ্চল উৎসাহ ব্যতীত ব্রত উদ্যাপন করা যায় না; আমি অবিচলিত উৎসাহ-সহকারে এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি।

না কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যামহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্॥

যেমন বধূ, তেমনি শ্বশুর। দ্যুমৎসেন বলিলেন—তুমি ব্রতভঙ্গ কর, এমন কথা আমি তোমাকে কিছুতেই বলিতে পারিব না; মা তুমি ব্রত উদ্যাপন কর, ইহা ভিন্ন আর কিছু তোমাকে বলা আমার উচিত নয়।

ব্রতং ভিন্ধীতি বক্তুং ত্বাং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন।
পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধো বদেৎ॥

তিন দিন তিন রাত্রির উপবাসে সাবিত্রী কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্বশুর শ্বশ্রূ চতুর্থ দিবসে আরও কাতর হইয়া বলি-

লেন, মা, তুমি যথানিয়মে ব্রত সম্পন্ন করিয়াছ, এখন আহার কর। কিন্তু যে কঠিন সঙ্কল্প করিয়া তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তখনও সিদ্ধ হয় নাই, রজনীতে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন—কামনা করিয়া ব্রতাবলম্বন করত আমি সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সূর্য্য অস্তগত হইলে তবে ভোজন করিব।

অস্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাময়া।
এষ মে হৃদি সংকল্পঃ শময়শ্চ কৃতো ময়া॥

এমন সময়ে পতিব্রতা দেখিলেন, কাষ্ঠাদি আহরণার্থ কুঠার হস্তে লইয়া পতি বনে গমন করিতেছেন। তিনি শ্বশুর শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া পতির সহিত গমন করিলেন। সত্যবান তাঁহাকে বনের শোভা দেখিতে বলিলেন। তিনি তখন সত্যবানকে কালকবলিত মনে করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তথাপি পাতিব্রত্যের সেই আদর্শরূপিণী হৃদয়কে যেন দুই ভাগে বিভক্ত কারিয়া এক কালে পতির সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের ভাবনা করিতে লাগিলেন।

নিরীক্ষমাণা ভর্ত্তারং সর্ব্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃতমেব হি তং মেনে কালে মুনিবচঃ স্মরন্॥

অনুব্রজবন্তী ভর্ত্তারং জগাম মৃত্যুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী॥

কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে করিতে সহসা সত্যবান শিরঃপীড়ায় বিষম ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া আপন অঙ্কে তাঁহার মাথা রাখিয়া বসিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরেই দেখিতে পাইলেন, 'রক্তবস্ত্রপরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, প্রশস্তকায়, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, শ্যাম-গৌরবর্ণ, লোহিতলোচন এক ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতে-ছেন।' সাবিত্রীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তিনি পতিব্রতা। তৎক্ষণাৎ পতির মস্তক ধীরে ধীরে অতিসন্তর্পণে ভূমিতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যেমন ভয়ানক কথা বলিতে হয়, যম তাহা বলিলেন। বলিয়া সত্যবানের সূক্ষ্মদেহ বাহির করিয়া লইয়া পাশবদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু পতিব্রতা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যম তাঁহাকে বলিলেন—আর আসিও না, তোমার যত দূর আসিতে পারা সম্ভব, তত দূর আসিয়াছ, এখন

ফিরিয়া গিয়া পতির শেষ কার্য্য কর; তাঁহার নিকট তোমার আর ঋণ নাই, তাঁহার ঋণ হইতে তুমি মুক্ত হইয়াছ। কিন্তু পতিব্রতা সে কথা শুনিলেন না। তিনি যে পতির ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখনও এরূপ মনে করিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ়তাসহকারে উত্তর করিলেন—'তপস্যা, গুরুভক্তি, পতি-স্নেহ, ব্রত ও আপনকার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে, আপনি আমাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন না। এই বলিয়া তিনি যমের নিকট অতি উচ্চ ধর্ম্মকথা কহিলেন। ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া স্বামীর জীবন ভিন্ন তাঁহাকে অন্য বর দিতে চাহিলেন। তিনি একটি বর লইলেন। কিন্তু আবার যমের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। যম তাঁহাকে পথশ্রান্তা দেখিয়া আবার ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। পতিব্রতা উত্তর করিলেন—স্বামীর কাছে থাকিলে শ্রান্তি আছে কি? আমি স্থির করিয়াছি, আমার স্বামীর যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে। আপনি আমার স্বামীকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমিও সেখানে যাইব—

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ সুরেশ ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে॥

এই কথা বলিয়া সাবিত্রী আবার ধর্ম্মকথায় যমকে সন্তুষ্ট করিলেন। আর একটি বর দিয়া যম তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। জ্ঞানধর্ম্মরূপিণী সাবিত্রীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মকথায় সন্তুষ্ট হইয়া যম তাঁহাকে আরও একটি বর দিয়া বলিলেন—বহু দূর আসিয়াছ, এইবার ফিরিয়া যাও। পতিব্রতা উত্তর করিলেন—পতির নিকটে আছি বলিয়া দূরে আসিয়াও আমার বোধ হইতেছে না যে দূরে আসিয়াছি; আমার মন আরও দূরে যাইতেছে—

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসন্নিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।

এই কথা বলিয়া তিনি যমকে ধর্ম্মকথায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যম বলিলেন, এমন কথা তোমার কাছে ভিন্ন আর কাহারও কাছে শুনি নাই। আনন্দে বিহ্বল হইয়া যম সাবিত্রীকে বর দিলেন, তোমার বলবীর্য্যশালী শত পুত্র হইবে। বর দিয়া এবং সাবিত্রীকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া সত্যবানের সূক্ষ্মদেহ লইয়া আবার গমন করিতে লাগিলেন। তেজোময়ী পতিব্রতা আবার তাঁহাকে ধর্ম্মকথায়

সন্তুষ্ট করিয়া আবার বরলাভের আশ্বাস পাইয়া বলিলেন—আমার পুণ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যেমন অন্যান্য বরগুলি দিয়াছেন, এ বরটিও তেমনি আমার পুণ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিন। পতির মৃত্যুতে আমি মৃতবৎ হইয়াছি,আমার পতিকে জীবিত করুন। পতি হারাইয়া আমি সুখকামনা করি না, পতিবিহীনা হইয়া আমি স্বর্গ কামনা করি না, পতিবিহীনা হইয়া আমার জীবনধারণ অসম্ভব। আপনিই বলিলেন, আমার শত পুত্র হইবে, কিন্তু আপনিই আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন। আমার পতিকে বাঁচাইয়া দিন, আপনারই বাক্য সত্য হউক—

ন তেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্বিনা কৃতস্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং যথা মৃতা হ্যেবমহং পতিং বিনা॥
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্॥
বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম ত্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি॥

ধর্ম্মরাজ সতবানকে জীবিত করিয়া পতিব্রতার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরাও সেই পর্য্যন্ত সম্ভ্রমসন্ত্রস্ত হইয়া ভক্তিপূর্ণ-অন্তঃকরণে বাষ্পাকুলনয়নে পাতিব্রত্যের সেই অমর, অক্ষর, অব্যয়, অতুলনীয় প্রতিমার প্রতি চাহিয়া আছি। বুঝাইতে পারি না, ইহা কি; বুঝিতে পারি না, ইহা কি; যখন দেখি, মর লোকের উপরে উঠিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইয়া কেবলই দেখি।

পঞ্চম অধ্যায়।

যম।

যমের যেমন দুর্নাম ত্রিভুবনে তেমন আর কাহারো নাই। লোকে যমকে যেমন ভয় করে তেমন আর কাহাকেও করে না। লোকে বলিয়া থাকে—যমের মায়া দয়া নাই, কৃপা করুণা নাই, হৃদয়ের কোমলতা কমনীয়তা নাই। যম নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম। যম কেবল মানুষ মারে—মায়ের কোল হইতে সন্তান কাড়িয়া লইয়া যায়, পত্নীর পার্শ্ব হইতে পতিকে অপহরণ করে, কনিষ্ঠকে লইয়া জ্যেষ্ঠকে কাঁদায়, জ্যেষ্ঠকে লইয়া কনিষ্ঠকে পথের ভিখারী করে, বড় বড় বংশ নির্ব্বংশ করিয়া দেয়,

বড় বড় গ্রাম, বড় বড় নগর, বড় বড় জনপদ উজাড় করিয়া দেয়। যমের জন্য ভগ্নহৃদয়, যমের জন্য ক্রন্দন, যমের জন্য হা হুতাশ, যমের জন্য শোক সন্তাপ। যমের মতন শত্রু মানুষের আর নাই। লোকে বলে, মানুষ মরিয়া যমালয়ে গিয়া অশেষ যন্ত্রণা পায়। শুনা যায়, কেহ কেহ মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গল্প করিয়াছে—যমালয়ে গিয়াছিলাম, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলাম, যম খাইতে দিল গোটা কতক নখ আর চারিটী ছেঁড়া চুল, পান করিতে দিল, একটী ধোনের চালে করিয়া এক বিন্দু জল, এই দেখ সেই নখ আর চুল গুলি আনিয়াছি। অনেকে নাকি দেখিয়াছেন, যমালয় হইতে প্রত্যাগত রোগীর বস্ত্রের কোণে নখ ও ছেঁড়া চুল বাঁধা রহিয়াছে। যমযন্ত্রণা, যমের পীড়ন, যমের দাগাদারি—লোকমুখে এইরূপ কথা অষ্ট প্রহরই শুনা যায়। লোকের বিশ্বাস—যমের ন্যায় শত্রু মানুষের আর নাই, যমের ন্যায় নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম, পীড়নপ্রিয়, ধ্বংস-কারী, সর্ব্বনাশকারী, ছারখারকারী আর কেহ নাই। এই জন্য লোকের সংস্কার—যমের মনও যেমন ভীষণ, মূর্ত্তিও তেমনি ভীষণ, অন্তরও যেমন কঠিন, আকারও

তেমনি বিকট। এ সংস্কারের আরো হেতু আছে। জীব যখন যমের অধিকারে গিয়া পড়ে তখন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে বিষম বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তবে যায়। বিধাতার বিধানে সে যন্ত্রণা সকলকেই দেখিতে হয়, সে যন্ত্রণা দেখিয়া সকলকেই কাঁদিতে হয়, অনেককেই বিহ্বহল হইতে হয়, কেহ কেহ পাগল হইয়া যায়। আর কেবলই কি সেই যন্ত্রণা ? আহা, কি পরিবর্ত্তন, কি বিকৃতি, কি পরিণাম ! সোণার বর্ণ তখন কালি হইয়া যায় ; বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু তখন প্রভাহীন কোটরগত ; কোকিলকণ্ঠ তখন ছিন্ন, ছন্দোহীন, অপরিস্ফুট, ভীতিজনক ; অমিত তেজ-সম্পন্ন মস্তিষ্ক তখন মহাপ্রলয়গ্রস্ত ; অনুপম লাবণ্য শোভা সৌন্দর্য্য কান্তি কমনীয়তা সমন্বিত নর দেহ তখন কঙ্কাল মাত্র ! যাহার অধিকারে যাইতে হইলে এই পরিণতি, এই বিকৃতি, এই পরিবর্ত্তন, তাহাকে যথার্থই অতি ভীষণ, অতি বিকটাকার মনে হইবার কথা—শুধু সামান্য লোকের মনে হইবার কথা নয়, মহাপুরুষ দিগেরও মনে হইবার কথা। পুরাণ-কার, শাস্ত্রকার, মহাকবি সকলেই যমের বড় ভীষণ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যমকে

দেখিয়া সাবিত্রীর ন্যায় নারীর হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিয়াছিলঃ—

ততঃসা নারদবচো বিমৃষন্তী তপস্বিনী।
তং মুহূর্ত্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ॥
মুহূর্ত্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্॥
শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।
স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যাস্য শনৈঃ শিরঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচার্ত্তা হৃদয়েন প্রবেপতা॥

অর্থাৎ

অনন্তর সেই তপস্বিনী নারদের বাক্য চিন্তা করত সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস যোজনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং মুহূর্ত্তকাল পরেই দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্র পরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, প্রশস্তকায়, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, শ্যামগৌরবর্ণ, লোহিতলোচন একজন ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারে দেখিবামাত্র সাবিত্রী ধীরে ধীরে পতির মস্তকটী ভূতলে বিন্যস্ত

করিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক কম্পমান হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে কাতর ভাবে এই কথা বলিলেন।

নরকযন্ত্রণার তুল্য যন্ত্রণা কল্পনা করা অসম্ভব বলিলেই হয়। পুরাণে এই নরকযন্ত্রণার পূর্ণমাত্রারও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে অসংখ্য নরক, অসংখ্য নরকে অসংখ্য প্রকার যন্ত্রণা বর্ণিত আছে। অসংখ্য যন্ত্রণাপূর্ণ অসংখ্য নরকের কথা পড়িতে পড়িতে অবসন্ন অভিভূত হইতে হয়। পাপীকে যমই সেই সকল নরকে নিক্ষেপ করেন। যম কর্ম্ম-ফল বিধাতা, তাঁহারই জন্য পাপীকে অসংখ্য নরকে, অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। লোকের তাঁহাকে অতি ভীষণ, অতি বিকটাকার মনে করিবার কথাই ত বটে। মহাকবি এবং পুরাণকারও যে তাঁহাকে ভয়ঙ্কর বিকটাকার পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও বিচিত্র নহে।

কিন্তু যে শাস্ত্রে ও সাহিত্যে যমের বাহ্য মূর্ত্তি এতই ভীষণ সেই শাস্ত্রে এবং সেই সাহিত্যেই যমের আভ্যন্তরিক মূর্ত্তি বড়ই মহান, মধুর, কমনীয়, করু-ণার্দ্র। কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে যম ব্রহ্মজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার, ব্রহ্মবিদ্যার বিপুলতম

আধার স্বরূপ প্রতীয়মান। আর মহাভারতকারের সাবিত্রীর উপাখ্যানে তাঁহাতে দেখি ধর্ম্মোন্মাদ এবং যে প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা কৃপা, করুণা, দয়া, সৌজন্য, শিষ্টতা প্রভৃতি মহামায়া রচিত মায়াময় জীবজগতের জীবন বা প্রাণস্বরূপ, তাহারই অতি রমণীয় অচিন্তিতপূর্ব্ব বিকাশ।

যমের কাছে ধার্ম্মিকের অসীম মর্য্যাদা। যম সত্যবানকে লইতে আসিবামাত্র সাবিত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন? যম কি উত্তর দিলেন, শুনুন—

পতিব্রতাসি সাবিত্রি তথৈব চ তপোঽন্বিতা।
অতস্ত্বামভিভাষামি——————॥

সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসমন্বিতা, এই নিমিত্ত আমি তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছি।

সাবিত্রী ধার্ম্মিকা না হইলে যম তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না। যিনি ধার্ম্মিক, যমের কাছে তাঁহার কত সম্মান, যমের তাঁহার উপর কত অনুগ্রহ, সাবিত্রী-উপাখ্যানে তাহা অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। কিন্তু যমের নিকট ধার্ম্মিকের মর্য্যাদার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ, ঐ উপাখ্যানেই আছে।

সাবিত্রী যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মৃতব্যক্তিকে লইয়া যাইবার জন্য আপনার দূতদিগকেই পাঠাইয়া থাকেন, আমার পতিকে লইয়া যাইবার জন্য আপনি স্বয়ং আসিয়াছেন কেন? যমের উত্তর শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়—

অয়ঞ্চ ধর্ম্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ।
নার্হো মৎপুরুষৈর্নেতুমতোঽস্মি স্বয়মাগতঃ॥

অর্থাৎ

এই সত্যবান ধর্ম্মসংযুক্ত, রূপবান ও গুণসাগর, সুতরাং আমার দূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহেন; এই নিমিত্তই আমি স্বয়ং আসিয়াছি।

সত্যবান ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মফলবিধাতা স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন, নহিলে ধর্ম্মের অবমাননা হয়, ধার্ম্মিকের অমর্য্যাদা হয়। যমের উদারতা, মহত্ত্ব, মহানুভবতায় মোহিত হইতে হয়।

আমরা বলি—যম নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, পাষাণহৃদয়। কিন্তু যমের অন্তঃকরণ কি কোমল দেখ,দেখি। যমের নিকট প্রথম বর লাভ করিয়াও যখন সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন, তখন, 'যাবদ্

গম্যং গতত্বয়া', তোমার যতদূর আসা সম্ভব তুমি তত দূর আসিয়াছ—এই বলিয়া যম তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু না ফিরিয়া আর একটী বর লাভ করিয়া তিনি আবার যমের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। তখন যম তাঁহাকে বলিলেন—এত পথ আসিয়া তুমি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, অতএব আর আসিও না, ফিরিয়া যাও, আরো আসিলে আরো ক্লান্ত হইবে।

তবাধ্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষয়ে নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব নতে শ্রমো ভবেৎ।

ইহা কেবল ধার্ম্মিকের প্রতি ধর্ম্মের সম্মান ও সহানুভূতির কথা নহে। ইহা হৃদয়ের কথা—স্নেহের কথা—করুণার কথা—বড় কোমল প্রাণের কোমল কথা। যম নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, পাষাণহৃদয় নহেন। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল, তিনি বড় স্নেহময়, তাঁহার অপূর্ব্ব করুণা। যতবার সাবিত্রী বর লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছেন, তত বারই তিনি তাঁহাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া এমনি কাতর হইয়া এমনি মধুর, এমনি করুণাপূর্ণ, এমনি স্নেহমাখা বাক্যে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন*।

* পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাষায় যমকে perfect gentleman বলিতে হয়।

তুমি অনেক পথ আসিয়াছ, আর আসিও না, ফিরিয়া যাও, আরো আসিলে আরো ক্লান্ত হইয়া পড়িবে—সেই মহারাত্রে সেই মহা গভীর মহারণ্যের মধ্যে কে থাকিয়া থাকিয়া এই মায়াময়, মোহময়, মধুময় কথা কহিয়াছিল ? কাহাকেই বা কহিয়াছিল ? ধর্ম্মরাজ যম কহিয়াছিলেন ধর্ম্মরূপিণী সাবিত্রীকে। যেখানে ধর্ম্ম, যমের সেখানে এমনি স্নেহ, এমনি মায়া, এমনি মোহ, এমনি করুণা। যম নিষ্ঠুর, যম নির্দ্দয়, যম নির্ম্মম—এ কথা বলিতে নাই—মনেও করিতে নাই। একথা বলিলেও পাপ, মনে করিলেও পাপ।

ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে নিয়তি। ধর্ম্মরাজ যম সেই নিয়তি রক্ষা করেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেন না। বিবাহের এক বৎসর পরে মরিবেন, সত্যবান এই নিয়তি লইয়া দ্যুমৎসেন গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়তি অনুসারে সত্যবানের মৃত্যু ঘটিল—যমও তদ্দণ্ডে তাঁহাকে লইতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল না। কেন হইল না ? তিনি যেমন সত্যবানকে লইলেন, অমনি সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গে যাইতে যাইতে তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মকথা শুনিয়া

আহ্লাদিত হইয়া সাবিত্রীকে একটী বর দিলেন—বর দিয়া সত্যবানকে লইয়া আবার যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না, ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে আবার গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ যত ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার উল্লাস ততই বাড়িতে লাগিল—তিনি একটী, দুইটী করিয়া তিনটী বর দিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখনও সত্যবানের নিয়তির কথা ভুলেন নাই—তখনও সাবিত্রীকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। কিন্তু সাবিত্রী ফিরিলেন না—আবার ধর্ম্মকথা কহিলেন। যম বলিলেন—এমন কথা আমি আর কাহারো কাছে শুনি নাই—

উদাহৃতং তে বচনং যদঙ্গনে শুভে ন তাদৃক্ ত্বদৃতে শ্রুতং ময়া।

তিনি সাবিত্রীকে আবার বর দিতে চাহিলেন। সাবিত্রী আপন গর্ভে সত্যবানের ঔরসে শত পুত্রের প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মরাজ তখন উল্লাসে উন্মত্ত, সত্যবানের কথা, সত্যবানের নিয়তির কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন, বলিয়া ফেলিলেন—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ধর্ম্মোল্লাসে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম-

রূপিণী সাবিত্রীর বৈধব্য-নিয়তি উড়াইয়া দিলেন। ধার্ম্মিকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া মহা-নিয়তি উড়াইয়া দেন—এ কেমন যম, বল দেখি। এ যমকে দেখিয়া উল্লাসে উন্মত্ত না হইয়া থাকা যায় কি ?

সাবিত্রীকে স্বামী ফিরাইয়া দিয়াই যম ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। মনের উল্লাসে তাঁহাকে কতকগুলি আশীর্ব্বচনে প্রীত করিয়া গিয়াছিলেন।

এষ ভদ্রে ময়া মুক্তো ভর্ত্তা তে কুলনন্দিনি।
অরোগস্তব নেয়শ্চ সিদ্ধার্থশ্চ ভবিষ্যতি॥
চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমবাপ্স্যতি।
ইষ্টা যজ্ঞৈশ্চ ধর্ম্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি।
ত্বয়ি পুত্রশতঞ্চাপি সত্যবান্ জনয়িষ্যতি॥
তে চাপি সর্ব্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
খ্যাতাস্ত্বন্নামধেয়াশ্চ ভবিষ্যন্তীহ শাশ্বতাঃ॥
পিতুশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি।
মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
ভ্রাতরস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ॥

অর্থাৎ

ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীকে এই মুক্ত করিয়া দিলাম; হে কুলনন্দিনি! তুমি স্বচ্ছন্দে

ইঁহারে লইয়া যাইতে পারিবে। এই সত্যবান রোগমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইবেন, তোমার সহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবেন, ধর্ম্মসহকারে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার গর্ভে একশত পুত্রও উৎপাদন করিবেন। সেই ক্ষত্রিয় পুত্রেরাও সকলে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও রাজা হইবে এবং পৃথিবীতে চিরকাল তোমার নাম বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তোমার মাতা মালবীর গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র হইবে এবং তোমার সেই দেবতুল্য ক্ষত্রিয় সহোদরেরাও পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া মালব নামে বিখ্যাত থাকিবে।

যমের ধর্ম্মোন্মাদ, যমের দয়া, কৃপা, করুণা, কোমলতা, কমনীয়তা, শুভানুধ্যায়িতা দেখিয়া অভিভূত হইতে হয়।

যমের বহির্ম্মূর্ত্তি সত্য সত্যই বড় ভয়ানক। যে মরে সে বড়ই ভয় দেখাইয়া, দুঃখ দিয়া, মর্ম্মস্থল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়া মরে। কিন্তু যমের অন্তর্ম্মূর্ত্তি বড়ই মহান, বড়ই রমণীয়। ধর্ম্মবল ব্যতীত সে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ধার্ম্মিকের

চক্ষে যম সর্ব্বকল্যাণদাতা সর্ব্ববিপদ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক—অতীব সুন্দর। যিনি ধার্ম্মিক তিনি যমে বা মৃত্যুতে ভয়বিভীষিকা না দেখিয়া পরম রমণীয়তাই দেখিয়া থাকেন এবং যম বা মৃত্যু হইতে পরম কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। যম বা মৃত্যুর সাহায্যেই ধার্ম্মিক জগতের নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন, মৃতেরা জীবনলাভ করিয়া থাকে। মৃত্যুর উপরই জীবনের প্রতিষ্ঠা। ধার্ম্মিকেরা ইহাও বুঝিয়া থাকেন যে যমের ভীষণতা, নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতা—সকলই অধার্ম্মিকের মনের বিভীষিকা, অধর্ম্মনাশার্থ প্রকৃতি প্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র—সুতরাং কল্যাণকামনামূলক, পরমকল্যাণপ্রদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সাবিত্রীর কথার অলৌকিকতা।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুংলঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

স্বামী বলিতেছেন—ভগবান কৃপা করিলে বোবায় কথা কহিতে পারে, পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে। যম বা ধর্ম্মরাজের কৃপায় সাবিত্রীর মৃতপতি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন, সাবিত্রীর বিধিবিহিত বৈধব্য ঘটিতে পারে নাই। বোবার কথা কহা, পঙ্গুর পর্ব্বতারোহণ, মৃতের পুনর্জীবন লাভ—এ সকলই অলৌকিক ব্যাপার। জড় প্রকৃতির নিয়মানুসারে বোবার কথা কহা অসম্ভব, পঙ্গুর পর্ব্বতে উঠা অসম্ভব, মৃতের পুনর্জীবিত হওয়া

অসম্ভব। জড় প্রকৃতির নিয়মানুসারে যাহা ঘটিতে পারে না তাহা যদি ঘটে তাহা হইলে লোকে বলিয়া থাকে, অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। আমাদের পুরাণাদি অলৌকিক ঘটনার বিবরণে পরিপূর্ণ। এই যে সাবিত্রীর কথার আলোচনা হইতেছে ইহাতে মৃত সত্যবানের পুনর্জীবন লাভ একটী অলৌকিক ঘটনা। প্রহ্লাদের বিষপানেও প্রাণনাশ না হওয়া, সমুদ্রতলে পর্ব্বতের পেষণেও জীবিত থাকা প্রভৃতি, অলৌকিক ঘটনা। পুরাণে এমন কত অলৌকিক কথা আছে তাহার সংখ্যা হয় না। ধ্রুবের তপোবলে ধ্রুবলোক পাওয়া অলৌকিক ঘটনা, যোগবলে বিশ্বামিত্রের নূতন জগতের সৃষ্টি অলৌকিক ঘটনা, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত পুত্রের পুনর্জীবিত হওয়া অলৌকিক ঘটনা। হিন্দুর পুরাণ অলৌকিকত্বের মহাগ্রন্থ। অলৌকিকত্বের অন্য গ্রন্থ যে আর নাই তাহা নহে—অনেক আছে, কিন্তু হিন্দুর পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

পুরাণে যে সকল অলৌকিক ঘটনার বিবরণ আছে সে সমস্তের একটী বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে

দেখা যায় তাহাই ভগবদ্ভক্তির গুণে, তপোবলে, যোগবলে, ধর্ম্মবলে ঘটিতেছে। ধ্রুব তপোবলে ধ্রুবলোক লাভ করিয়াছিলেন, ভগবদ্ভক্তির আতিশয্যে কি এক অসাধারণ শক্তি লাভ করিয়া প্রহ্লাদ অগ্নি, জল, বিষ প্রভৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সাবিত্রী অসাধারণ ধর্ম্মবলে মৃতপতিকে পুনর্জীবিত করাইয়া আপন বিধিবিহিত বৈধব্য নিবারণ করিয়াছিলেন। তপোবল, যোগবল, ধর্ম্মবল, ভগবদ্ভক্তি যাহাই বল, সকলই আধ্যাত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিক শক্তিতে যে প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়, আধ্যাত্মিক বলে যে জড় প্রকৃতিকে পরাস্ত, পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, পুরাণে পুরাণকারদিগের এই বিশ্বাস বড়ই গভীর, বড়ই দৃঢ়, বড়ই জীবন্ত দেখা যায়। পুরাণকারের প্রকৃতিতে এই বিশ্বাস বড়ই গূঢ় নিহিত। এই বিশ্বাস পুরাণকারের প্রকৃতির মহাপ্রাণ স্বরূপ। তোমার মনে পুরাণকারের যে ধ্যান আছে, তাহা হইতে তাঁহার এই বিশ্বাস সরাইয়া ফেল, দেখিবে পুরাণকার উড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ প্রতিভা পরমাত্মা সকলই নিভিয়া গিয়াছে, তিনি

ক্রূরকল্পিত প্রাণশূন্য পৌত্তলিকের অধম হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্বাসের প্রকৃতি কিরূপ, সাবিত্রীর উপাখ্যান হইতে দুই চারিটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। রাত্রি গভীর হইয়াছে, তথাপি পুত্র সত্যবান পত্নীসহ অরণ্য হইতে গৃহে আসিতেছেন না দেখিয়া,দ্যুমৎসেন ও দ্যুমৎসেন পত্নী মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আশ্রম, নদী, বন প্রভৃতি অন্বেষণ করিয়াও পুত্র ও পুত্রবধূকে না পাইয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া রোদন করিতেছেন। তখন অন্যান্য তাপসগণ তাঁহাদিগকে কি বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, দেখুন। সুবর্চ্চা বলিলেন—"সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচার সংযুক্তা, তাহাতে সত্যবান নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।"

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবিত সত্যবান্॥

ভরদ্বাজ ও ঠিক ঐ কথা বলিলেন। গৌতম বলিলেন—"আমি অঙ্গসহ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, মহতী তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি, গুরুগণ ও অগ্নিকে তুষ্ট করিয়াছি এবং সর্ব্বদা বিধিপূর্ব্বক বায়ু ভক্ষণ ও

উপবাসও করিয়াছি; এই তপস্যা দ্বারা পরের সমস্ত অভিপ্রেত অবগত আছি, অতএব সত্যবান জীবিত আছেন, একথা তুমি সত্য বলিয়াই অবধারণ কর”।

দেবাঃ সাঙ্গা ময়াধীতাস্তপো মে সঞ্চিতং মহৎ।
কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গুরুবোঽগ্নিশ্চ তোষিতাঃ॥
সমাহিতেন চীর্ণানি সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানি চ।
বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বক্ত্রাদ্‌যথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্।
নৈব জাতু ভবেন্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্॥

দালব্য বলিবেন—“তোমার যখন পুনরায় দর্শন-শক্তি হইয়াছে এবং সাবিত্রী যখন তাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানের পর আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান্ নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।”

যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্।
গতাহারমকৃত্বা চ তথা জীবতি সত্যবান্॥

এদিকে আশ্রমে তপস্বিগণ চিন্তাকুল দ্যুমৎ-সেনকে এইরূপ বলিলেন—ওদিকে অরণ্যে সত্যবান পুনর্জীবন লাভ করিয়া পিতামাতার নিমিত্ত আকুল হইলে সাবিত্রী বলিলেন—যদি আমি তপস্যা, দান বা হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই রজনীতে

আমার শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও স্বামীর কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। আমার মনে হয় না যে পরিহাস করিয়াও আমি কখন মিথ্যা কথা কহিয়াছি, আমার সত্যনিষ্ঠার ফলে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ আজ জীবিত থাকিবেন।

যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি।
শ্বশ্রূশ্বশুরভর্তৃণাং মম পুণ্যাস্তু শর্ব্বরী॥
ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বাং বৈ স্বৈরেষ্বপ্যনৃতাং গিরম্।
তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম॥

আমি কঠিন ধর্ম্মচর্য্যা করিয়াছি, দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি, অতএব কোথায় কি ঘটে গৃহে বসিয়াই জানিতে পারি, আমি বলিতেছি, সত্যবান বাঁচিয়া আছেন। সাবিত্রী যখন কঠিন ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অনশনে বনে গিয়াছেন তখন সেখানে তাঁহার পতি সত্যবান অবশ্যই জীবিত আছেন। আমি সাবিত্রী যদি সত্যনিষ্ঠ হই,ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকি,তবে আমার শ্বশুর শ্বশ্রূর কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারিবে না। এ সকল কেমন কথা,আমরা ভাল বুঝিতে পারিনা। কিন্তু আমাদের পুরাণকারেরা এমনি কথাই বেশী কহিয়া-গিয়াছেন, এমনি কথা কহিবার জন্যই যেন তাঁহাদের জগতে আবির্ভাব হইয়াছিল। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে

সত্যবান অকাল মৃত্যুরূপ নিয়তি লইয়া দ্যুমৎসেন-পুত্র রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর ধর্ম্মবলে তাঁহার সেই নিয়তি খণ্ডিত হইয়াছিল। স্বয়ং সাবিত্রী পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে অকাল বৈধব্যরূপ নিয়তি লইয়া অশ্বপতির গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার আপন ধর্ম্মবলে তিনি সেই নিয়তি অতিক্রম করিয়াছিলেন। ধ্রুবও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে অতি শোচনীয় নিয়তি লইয়া উত্তানপাদ রাজার অনাদৃতা মহিষীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া অসামান্য তপোবলে সে নিয়তি উল্লঙ্ঘন করিয়া অতি অভূতপূর্ব্ব অলোকসামান্য অত্যুৎকৃষ্ট নিয়তি অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কত কথা পুরাণে আছে,সংখ্যা হয় না। ধর্ম্মবলের অসাধ্য কিছুই নাই; যাহা সিদ্ধ হইবার নয় ধর্ম্ম বলের গূঢ় ক্রিয়ায় তাহা সিদ্ধ হইয়া যায়, অসম্ভব সম্ভব হইয়া পড়ে, জড় প্রকৃতি পরাভূত পরিবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মবল আমার,আমার কাছে পরাস্ত হইলে তুমি। ধর্ম্মবল তোমার, তাহাতে বিপদ কাটিয়া গেল আমার। সকল বলের উপর ধর্ম্মবল; সকল বলের মধ্যে ধর্ম্মবলই শ্রেষ্ঠবল। এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে এখনও আছে। বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ-

কান্তের উইলে লিখিয়াছেন যে, গোবিন্দলাল যখন পত্নী ভ্রমরের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা দিয়া, বোধ হয় আর আসিব না, এই কথা বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া যায় তখন ভ্রমর বলিয়াছিল—"দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। * * এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি একথা নিস্ফল হয় তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী।" ঘটিয়াছিলও তাই। সতীর কথাই ফলিয়াছিল। গৃহত্যাগী গোবিন্দলালকে আবার গৃহে আসিতে হইয়াছিল—আবার ভ্রমরের জন্য কাঁদিতে হইয়াছিল। পাপ সম্ভূত যে শক্তি গোবিন্দলালকে গৃহ হইতে, সতী স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল, দেবতাদিগের প্রভাবে, ধর্ম্মবলের কাছে, সতীর সতীত্বের নিকট তাহা পরাস্ত হইয়াছিল। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এখনও আমাদের মধ্যে জীবন্ত রহিয়াছে, ঘরে ঘরে জাজ্বল্যমান। ধার্ম্মিক এখনও

বলিতেছেন—আমি যদি যথার্থ সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া থাকি, যদি কখনও কাহারো অনিষ্টচিন্তা না করিয়া থাকি, তবে আমার অপকার সাধনার্থ তাহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। সতী এখনও গর্ব্ব সহকারে বলিতেছেন—পতির পদে যদি আমার মতি থাকে, তাহা হইলে কেহই আমাকে মনঃকষ্ট দিতে পারিবে না। এদেশে অতি সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান, অপর সমস্ত বল তাহার নিকট পরাস্ত, জড়প্রকৃতির যে প্রলয়ঙ্করী শক্তি আছে, তাহাও তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। বিগত ৩০এ ভাদ্রের 'সময়' নামক বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে একটি অতি অসাধারণ গ্রাম্য লোকের কথা লিখিত হইয়াছিল। ন্যূনাধিক ১২৫ বৎসর অতীত হইল নাগারাম সিংহ নামক এক ব্যক্তি বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে সিলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগারামের প্রথমাবস্থা শোচনীয় ছিল। তিনি ধান্য সরিষা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহা বিক্রয় করিতেন। এবং এইরূপে যাহা পাইতেন, বহুকষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিয়া তাহার কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন।

সঞ্চিত অর্থে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি গাভী, চাষের গরু ও মহিষ ক্রয় করিলেন এবং তাহার পর চারি খানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। এইরূপে বহু পরিশ্রমে তিনি ক্রমে ক্রমে অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার পাঁচশত গাভী ছিল। "কাহারো দুগ্ধের অভাব হইলে নাগারাম তাহাকে বিনা মূল্যে গাভী বিতরণ করিতেন। তাঁহার অনেক গুলি সহোদর, খুড়তুতা এবং জ্যেঠতুতা ভাই ছিল। তাহাদের প্রত্যেককে তিনি এক একটী কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন; কেহ গো-সেবা, কেহ কুটুম্ববাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা, কেহ তেজারতি, কেহ চাষ, কেহ অন্য কাজ করিতেন। অতিথিসেবার ভার এক ভাইয়ের উপর ন্যস্ত ছিল বটে, কিন্তু নাগারাম সর্ব্বদা সেই কার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় গ্রামে সকলের বাটীতে যাইয়া তত্ত্ব লইতেন। কাহারো কোন অভাব দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা মোচন করিতে চেষ্টা করিতেন। পীড়িত গ্রামবাসীর চিকিৎসা করাইতেন এবং যত দিন সে ভাল না হইত, ততদিন তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয়

নিজে বহন করিতেন। সিলামপুর গ্রামের মধ্য দিয়া গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া যত অতিথি, ফকীর এবং পীড়িত লোক যাইত তাহারা নাগারাম সিংহের অতিথিশালায় না থাকিয়া অন্যত্র যাইত না। এই প্রকারে নাগারামকে কখন কখন পাঁচশত লোকের আহারাদি যোগাইতে হইত। ইহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে নাগারাম নিজে তাহার সেবা করিতেন। পীড়িত ব্যক্তি মল মূত্র ত্যাগ করিলে তিনি স্বহস্তে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতেন এবং তাহার মলসংযুক্ত বস্ত্রাদি নিজে ধৌত করিতেন। নফর সিংহ নামে তাঁহার এক প্রভূত বলশালী ভ্রাতা ছিলেন। অতিথিশালায় যে সকল অতিথির মৃত্যু হইত তাহাদিগকে শ্মশানে ফেলিয়া দিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। * * নাগারাম নিজে সপরিবারে কাঁচা খোড়ো ঘরে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেবালয় ও অতিথিশালা ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে কখন কিছু গহনা দেন নাই। এক সময়ে তিনি দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রীর হাতে দুগাছি রূপার খাড়ু রহিয়াছে। স্ত্রীকে নানা প্রকার কৌতুক করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

'তুমি এ গহনা কোথায় পাইলে এবং কত টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছ?' স্ত্রী উত্তর করিলেন, 'ষোল টাকা দিয়া তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত তাঁহাকে গড়াইয়া দিয়াছে।' আহারান্তে নাগারাম খাড়ু দুগাছি চাহিয়া লইলেন এবং শিলাখণ্ডে রাখিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি গৃহিণী হইয়া আমার সদাব্রতের ঘরে গহনা পরিলে আমি আমার অন্যান্য আত্মীয়া স্ত্রীলোককে দিতে কোথায় পাইব।' নাগারামের স্ত্রী লজ্জিতা হইয়া তদবধি আর গহনা পরিধান করেন নাই।" * * "পরদুঃখে নাগারামের মন সর্ব্বদাই কাঁদিত। কেহ কোন বিপদে পড়িলে নাগারাম শরীর দিয়া হউক, অর্থ দিয়া হউক, যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন।" বঙ্গের এই সামান্য পল্লীবাসী নাগারামকে গ্রাম্যলোকেরা কিরূপ মান্য করিত শুনুন—"সিলামপুরের নিকটবর্ত্তী দামোদর দিয়া যত নৌকা যাইত, অগ্রে নাগারামের নৌকা না যাইলে অপর কেহ নৌকা ছাড়িত না।" ভগবানের রাজ্যে এই অপ্রথিতনামা দয়াবতার নাগারামের শক্তি সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সম্বন্ধে

পল্লীবাসী মাঝি মাল্লাদের কিরূপ বিশ্বাস ছিল তাহাও শুনুন—"মাঝিরা বলিত, নাগারামের নৌকা ধর্ম্মের নৌকা, কখনও ডুবিবে না ; সুতরাং তাহার সঙ্গে গমন করিলে, তাহাদের নৌকাও জলমগ্ন হইবে না।" "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং"—শাস্ত্রকারের এই বিশ্বাস আর বঙ্গের লোক সাধারণের এই বিশ্বাস একই।

সকল বলের মধ্যে ধর্ম্মবলের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে আর একটী বিশ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মবলে স্বয়ং ধার্ম্মিক রক্ষিত হন এবং ধার্ম্মিকের আত্মীয় স্বজন রক্ষিত হয়, এ বিশ্বাস অপেক্ষা সে বিশ্বাস অধিকতর প্রশস্ত। পুরাণকারেরা নানা স্থানে বলিয়াছেন—ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি দুর্দ্দৈব ঘটে না, অগ্নি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা ও দিকপালগণ তাঁহাদের অনুকূল হইয়া কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রজাবর্গ নিরাপদে, নির্বিঘ্নে, ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া পরমসুখে কালযাপন করে। এ বিশ্বাস এখনও এদেশে আছে—লোকসাধারণের মধ্যে ত আছেই, বোধ হয়

যে চিন্তাশীল ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যেও আছে।

নানা প্রকার বিশ্বাসের কথা কহিলাম। প্রত্যেক বিশ্বাসের সমূলকত্ব বা অমূলকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি, এমন শক্তি সামর্থ্য আমার নাই। অথচ এ প্রকৃতির বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, এরূপও মনে করিতে পারি না। ভগবদ্ভক্তিতে পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে—এই এক প্রকার বিশ্বাস। এখনকার বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন—পর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেহের যে অবস্থার প্রয়োজন পঙ্গুর দেহের অবস্থা যখন তাহার বিপরীত, তখন এ বিশ্বাস অমূলক, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্থূল দৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে। কেবল মাত্র জড়প্রকৃতির নিয়মের প্রতি দৃষ্টি করিলে, পঙ্গু পর্ব্বতলঙ্ঘন করিতে পারে, কিছুতেই এমন কথা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু মানুষে কেবলই জড় প্রকৃতি নাই, আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও আছে। মানুষের এই দুই প্রকৃতির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু সম্বন্ধ যে আছে, তদ্বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ হইতে পারে না। জড়প্রকৃতির নিয়মানুসারে,

উপবাসে বা অনাহারে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কাজকর্ম্মে অসমর্থ হয়। একবেলা না খাইলে আমরা একটু কাতর হই, দুইবেলা না খাইলে বিশেষ কষ্টানুভব করি, তিনবেলা না খাইলে নির্জীব হইয়া পড়ি। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী স্ত্রী ধর্ম্মচর্য্যার্থ একাদিক্রমে দুই তিন দিন নিরম্বু উপবাস করিয়াও বিশেষ কাতর বা ক্লান্ত হন না, নির্জীবতা অনুভব করেন না, উপবাস না করিয়া যেমন সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, প্রায় তেমনিই করিতে থাকেন। তাঁহাদের এই উপবাস-ব্যাপার যাঁহারা ভাল করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মে মতি যাঁহার যত, বেশী, উপবাসে তাঁহার তত উৎসাহ ও উল্লাস উপবাসে কষ্টক্লান্তি তাঁহার তত কম এবং ধর্ম্মে মতি যাঁহার যত কম, উপবাসে তাঁহার তত অনিচ্ছা ও আগ্রহাভাব, উপবাসে কষ্টক্লান্তি তাঁহার তত অধিক। বাঙ্গালীর স্ত্রীর উপবাস-রহস্যে মানুষের জড় প্রকৃতির সহিত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সম্বন্ধ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। জড়প্রকৃতির নিয়মানুসারে অনশনের যাহা অনিবার্য্য ফল, আধ্যাত্মিক প্রকৃতির জন্য

বাঙ্গালীর স্ত্রীতে তাহা ফলিতে পারে না অথবা অতি অল্প মাত্রই ফলে। ভারতের ঋষিতপস্বীরা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ছিলেন। অনশন-তত্ত্ব তাঁহারা যেমন বুঝিতেন, বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ তেমন বুঝেন নাই।

সাবিত্রীর সম্বন্ধে তাপসবর দালব্য বলিয়াছিলেন —'সাবিত্রী যখন তাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানের পর আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন।' সাবিত্রীর তিন দিন তিন রাত্রির উপবাসের পর তাঁহার শ্বশুর যখন কাতর হইয়া তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তখন তিনি কি উত্তর করিয়াছিলেন তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন 'হে তাত! আপনি সন্তাপ করিবেন না, আমি ব্রত সমাপ্তি করিতে পারিব। ব্রত সমাপ্তির কারণ কেবল নিশ্চল উৎসাহ, আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন করিয়াছি।' অতি কঠিন, অতি উচ্চ সঙ্কল্প সাধনার্থ সাবিত্রী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সঙ্কল্প সাধন না করিয়া আহার করিব না। তিনি শ্বশুরকে যে উত্তর করিয়াছিলেন

তাহার অর্থ এই যে, তাঁহার সেই সঙ্কল্প সাধন করিবার পূর্ব্বে আহার করিলে, সে সঙ্কল্প সাধিত হইবে না, সে সঙ্কল্প সাধন করিতে দেহের এবং মনের যে অপরিমিত শক্তির প্রয়োজন তাহা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। তিন দিন তিন রাত্রির উপবাসে তিনি দেখিতে কাঠের পুতুলটীর মতন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই উপবাসের ফলে তাঁহার দেহের ও মনের শক্তির কি আশ্চর্য্য ও অপরিমিত বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছিল তাহা সেই ভীষণ রাত্রির অলৌকিক ঘটনাতেই প্রকাশ। জড় প্রকৃতির নিয়মানুসারে উপবাস বা অনশনের যাহা স্বাভাবিক ফল, মহান উদ্দেশ্য সাধনার্থ কৃতসঙ্কল্প বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উপবাস করিলে তাহা না ফলিয়া তাহার বিপরীত ফলই ফলে, অর্থাৎ শক্তিহীনতার পরিবর্ত্তে বর্দ্ধিত শক্তি, নিরুৎসাহের পরিবর্ত্তে বর্দ্ধিতোৎসাহ, মানসিক বিক্ষেপের পরিবর্ত্তে মনের অসীম একাগ্রতা, এইরূপ ফলই ফলে। ইহাকে অলৌকিকতা বলিতে ইচ্ছা হয়, বল। মানব মধ্যে এই রূপই কিন্তু ঘটিয়া থাকে। অলৌকিক হইলেই অবিশ্বাস্য হয় না।

জড় প্রকৃতির নিয়মানুসারে পঙ্গুর পর্ব্বতে উঠা

অসম্ভব। কিন্তু পঙ্গুকে পর্ব্বতে উঠিতে দেখিয়াছি। একটী হিন্দু রমণীকে জানিতাম। রমণী যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী ছিলেন। পতিপুত্রাদিতেও সৌভাগ্যবতী ছিলেন। বোধ হয় তাঁহারই জন্য তাঁহার পতি অতি হীনাবস্থা হইতে বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পতির অর্থে তিনি অন্নদান, আত্মীয় পালন, দেবপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্য করিয়াই তুষ্টিলাভ করিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বৎসর তখন তিনি অম্লরোগে আক্রান্ত হন। নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের উপশম হয় নাই। রোগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। বাড়িয়া বাড়িয়া বিষম জ্বরে পরিণত হইল। তিনি অস্থিচর্ম্মসার হইলেন—তখন তাঁহার অস্থি প্রৌঢ়ার অস্থি নয়, শিশুর অস্থি। আমি তাঁহার সেই শীর্ণ অঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতাম। বোধ হইত, তাঁহার সেই অস্থিগুলি অস্থি নয়, পাটের কাটি। তাঁহার উত্থান শক্তি চলিয়া গেল। ক্রমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার শক্তিও কমিয়া আসিল। এমন সময় এক ব্যক্তি বলিল—বালশীর চরণামৃত পানে রোগের শান্তি হইবে। বাঁকুড়া জেলায় বালশীগ্রাম। তথা-

কার ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বড় প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের চরণামৃত পান করিলে অনেক কঠিন রোগ আরাম হইয়া যায়। রমণী সেই চরণামৃত পান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইচ্ছা, আপনিই গিয়া পান করিয়া আসেন। পতি-পুত্রাদি কেমন করিয়া যাইতে দিবে? চরণামৃত বড় শুদ্ধাচারে আনিতে হয়। এক বিশ্বাসী ব্যক্তি আনিতে গেল। তিন চারি দিন পরে চরণামৃত আসিল। তখন বেলা ৮।৯ ঘণ্টা। বহির্দ্বারে আসিয়াই সেই ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিল—চরণামৃত আনিয়াছি। রমণী দোতোলার একটী গৃহে ছিলেন, শুনিতে পাইলেন। তখন সেই জীর্ণশীর্ণ কঙ্কাল শয্যা হইতে উঠিল। সকলে দেখিয়া ভীত হইল, কিন্তু কেহ নিষেধ করিতে পারিল না—সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কঙ্কাল বাটীর বহির্দ্বারে গিয়া আপন হস্তে চরণামৃত লইয়া প্রথম সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিল—তাহার পর দ্বিতীয় সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিল—তাহার পর তেতোলার যে ঘরে গৃহ দেবতা ছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেবতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া চরণামৃত পান করিয়া দেবতারই কাছে চরণামৃত

রাখিয়া সোপানাবতরণ পূর্ব্বক আপন কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিল। ইহাই ত পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন।

ফলতঃ মানুষের জড় প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যে দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ অতি গূঢ়—সে সম্বন্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করা সামান্য মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব—বোধ হয় যাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণবিকাশ এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পূর্ণ প্রখরতা লাভ করিয়াছে কেবল তাঁহারাই সে সম্বন্ধের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন। আমরা অকিঞ্চন, সে সম্বন্ধের প্রকৃতি কেমন করিয়া বুঝিব? কিন্তু সে সম্বন্ধের প্রকৃতি বুঝি না বলিয়া সে সম্বন্ধের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই, যাহা অনেক সময়ে অনুভব পর্য্যন্ত করি, তাহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? মানুষের কার্য্য কলাপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যেখানে জড় ও চৈতন্য দুইই আছে, সেখানে জড়ের ক্রিয়া চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অসম্পৃক্তভাবে হয় না। জড়ের ক্রিয়া চৈতন্যের অধীনে হইয়া থাকে। পঙ্গু যে ভক্তিতে পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, ব্রতাবলম্বী যে উপবাসে ক্লিষ্ট হয় না, ইহাতে অস্বাভাবিকতা বা অলৌ-

কিকত্ব কিছুই নাই। আধ্যাত্মিক শক্তি ও দৃষ্টির অভাবে আমরা বুঝিতে পারি না ও দেখিতে পাই না বলিয়া উহাকে অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলি। প্রকৃত পক্ষে অগ্নির ক্রিয়া জলে নষ্ট হওয়া যেমন স্বাভাবিক, আধ্যাত্মিক শক্তিতে দেহের শক্তিহীনতা বিদূরিত হওয়া বা ঘটিতে না পারাও তেমনি স্বাভাবিক।

আরো কথা আছে। যেখানে চর্ম্মচক্ষে জড় ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, সেখানেও কেবল মাত্র জড়ের ক্রিয়া হয় না, সেখানেও জড়ের ক্রিয়া চৈতন্যের অধীনে হইয়া থাকে। চৈতন্যহীন জড় বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকি, চিন্ময়ের প্রকাশিত জগতে তাহা নাই, থাকিতে পারেও না। যাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়, তাহার সকলই ব্রহ্ম, সকলই চৈতন্য। তাহাতে অগ্নি, জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আমাদের চর্ম্ম চক্ষে চৈতন্যহীন জড় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা চৈতন্যহীন জড় নয়, তাহাও চৈতন্য অথবা চৈতন্যের রূপান্তর মাত্র। কেমন করিয়া চৈতন্যের অমন চৈতন্যহীন মূর্ত্তি ও অবস্থা হয়, আমরা বুঝিতে পারি না, বুঝিবার জন্য যে অসীম পরিবর্ত্তন

ও পরিণতির প্রয়োজন, তাহা আমাদের হয় নাই। কিন্তু বুঝিতে পারি না বলিয়া কেমন করিয়া বলি যে চৈতন্য যাহার উপাদান, তাহা চৈতন্য নয়, তাহাতে চৈতন্য নাই, তাহা কেবলই চৈতন্যহীন জড়? যদি বল, জগৎ ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের সৃষ্ট; তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, জগতে যে সকল পদার্থকে লোকে সচরাচর চৈতন্যহীন জড় পদার্থ বলে সেই সকল পদার্থের শক্তি, গুণ, ক্রিয়া-প্রণালী প্রভৃতি সমস্তই চিন্ময়ের প্রদত্ত, চিন্ময় হইতে উদ্ভূত—সুতরাং সে সমস্তের অর্থ আছে, অভিপ্রায় আছে, উদ্দেশ্য আছে। সে অর্থ, সে অভিপ্রায়, সে উদ্দেশ্য সৃষ্টি হইতে আছে, প্রলয় পর্য্যন্ত থাকিবে। ইহার অন্যরূপ কল্পনা মনুষ্যের অসাধ্য। অতএব অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে লোকে সচরাচর চৈতন্য-হীন জড় বলিয়া থাকে, তাহাও চৈতন্যের সংস্রবশূন্য নয়, তাহারও ক্রিয়া চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে হয় না, চৈতন্যের অধীনে হয়। বোধ হয় এইরূপ বুঝিয়াই আধ্যাত্মিকশক্তিশালিনী শ্রীমতী আনি বেসান্ত লিখিয়াছেন ঃ—

"We will turn to the great God Varuna.

He works through water; every manifestation of water is his, whether on the physical or on any other plane, in any of the forms it may take, for what we call 'water' is naturally the lowest, coarsest manifestation, his physical body as it were. He works with it in nature in endless ways—to dissolve, to combine, to dissociate. When we take the great workings, how very grand is the conception we may gain of the might of the god. Come back with me, far back, into the past, ere humanity had taken form; there see the world as it then was; see how, as fire and water, Agni and Varuna are working on every material to fit the world to be the birth place of the yet unborn humanity. See how Varuna is working inorder to prepare what is wanted of mountain and of valley, of river and of plain; see the might of his work as well as that of his brother Agni, in apparent clash but really in harmony; fire and water meet, explode, and toss up a mountain chain where before there was none; see how he gathers snow on the mountain peaks, and gradually fills with masses of this snow, frozen into ice, the mountain ravines made

by the combined volcanic action; see how the slow *ploughing* begins; *ploughing*, ploughing and ploughing again, as the mighty God works onward in the form of glaciers, grinding his furrow through the earth, and preparing for the future; see, ages later, how the channel cut out by the glacier is filled by the tumbling cataracts from melted snow, and a turbulent torrent rolls downwards, and against its resistless waves nothing is able to stand; the valley dug out by the plough of ice is filled with water, and from it the soil is deposited, which in the future, will make fertile land for crops in order that man may live. Then Varuna binds his waters into narrower and narrower channel, until there is mountain range and valley and a river flowing through it; and he carries his river downwards and pours it into the sea and his brother Agni draws it up again to form the clouds. There has come by that mighty action, destructive as it seems in appearance, the building of the plain and the valley where men shall live and love, where children shall be playing, where horses shall graze, where corn shall

grow and ripen in the sunshine, and where, on the peaceful banks of the river, men shall worship the God who made possible their happy life.*"

(ইহার ভাবার্থ)

'বরুণ দেবের ক্রিয়া জলে হইয়া থাকে। জলের যত রূপ দেখা যায় সকলই তাঁহার রূপ। জলের নানা রূপ আছে। জলের যে রূপকে সচরাচর 'জল' বলা হইয়া থাকে তাহা বরুণের অতি নিকৃষ্ট রূপ, তাঁহার জড় দেহ স্বরূপ। সংযোগ, বিয়োগ, দ্রবী-করণ প্রভৃতি অনন্ত কাজ বরুণ জল দ্বারা অনন্ত প্রকারে করিয়া থাকেন। বরুণের বড় বড় কার্য্য দেখিলে তাঁহার ক্ষমতা কত বেশী তাহা বুঝিতে পারা যায়। বহু প্রাচীন কালে, পৃথিবীতে যখন মানবের আবির্ভাব হয় নাই, পৃথিবী যাহাতে মনুষ্যের বাসযোগ্য হয় এই উদ্দেশ্যে অগ্নি ও জলের তখন ক্রিয়া হইয়াছিল। মনুষ্যের বাসের জন্য পর্ব্বত নদ নদী প্রভৃতি যাহা আবশ্যক বরুণ তাহার উৎপাদন পক্ষে কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং অগ্নি স্থূল দৃষ্টিতে

* শ্রীমতী আনি বেশান্তের 'Evolution of life and form' নামক পুস্তকের ৫৯ হইতে ৬১ পৃষ্ঠা।

বরুণের বিরোধী বোধ হইলেও, অগ্নি এবং বরুণ দুই দেবতাই সম্মিলিত ভাবে তদুদ্দেশে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যেখানে পর্ব্বত ছিল না, অগ্নি ও জলের সম্মিলিত ক্রিয়ায় তথায় পর্ব্বতশ্রেণী হইল। সেই পর্ব্বতের শিখর দেশে বরুণের কার্য্যফলে তুষার জমিল, সেই তুষার জল ও অগ্নির ভীষণ সংযোগে পর্ব্বতগাত্রে উৎপাদিত বড় বড় গহ্বরে জমাট বাঁধিয়া বরফ হইল; সেই বরফের বড় বড় খণ্ড সকল যেমন ছুটিতে লাগিল অমনি ভূপৃষ্ঠ যেন মহা হল দ্বারা কর্ষিত হইয়া পড়িল। কতকাল পরে বরফ গলিয়া গলিয়া আসিয়া সেই খাদ পূর্ণ করিয়া ফেলিল; তখন এক মহা বেগবতী স্রোতস্বতী ভীম রবে ছুটিতে আরম্ভ করিল। দেবতাদিগের এইরূপ ক্রিয়ার ফলে মনুষ্য আবির্ভূত হইয়া প্রচুর খাদ্য পাইবে বলিয়া ক্রমে উর্ব্বরা ভূমি প্রস্তুত হইল; সেই উর্ব্বরা ক্ষেত্রের মধ্যদিয়া বরুণ স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করাইয়া দিলেন। স্রোতস্বিনী কত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হইল। তথায় অগ্নি সেই স্রোতস্বিনীর সলিল আবার তুলিয়া লইয়া মেঘের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে দুইটী দেবতার

যে সমস্ত ক্রিয়া মহাধ্বংস ক্রিয়া রূপে প্রতীয়মান হয় তাহার ফলে মনুষ্যের বাসের, মনুষ্যের সুখশান্তি ভোগের এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী পর্ব্বত প্রান্তর নদ নদী প্রভৃতি সমন্বিত এবং সুশোভিত মহাপ্রদেশ সকল প্রস্তুত হইল।'

বিশ্বে চৈতন্য হইতে জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। জড় চৈতন্যের রূপান্তর মাত্র, ব্রহ্মের মায়া বা মায়া-মূলক বিকাশ মাত্র। ওকথা যদি না মান, তথাপি জড়ের গুণ, শক্তি, ক্রিয়া-প্রণালী প্রভৃতি যে চৈতন্য প্রদত্ত তাহা অস্বীকার করিতে পার না।

নাস্তিক ভিন্ন অপর সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের চর্ম্মচক্ষে যাহা কেবল মাত্র জড়ের ক্রিয়া স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহা শুদ্ধ জড়ের ক্রিয়া নয়, জড়রূপী চৈতন্যের অথবা চৈতন্য পরি-চালিত জড়ের ক্রিয়া। আধুনিক জড় বিজ্ঞানে জড় প্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। যে ঘটনায় সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, অনেকে তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। কিন্তু জড় বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত জড় প্রকৃতির যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়াছে তাহার সংখ্যা অতি

অল্প। দ্বিতীয়তঃ জড় যখন চৈতন্য হইতে একেবারে অসংশ্লিষ্ট নয়, তখন কোন ঘটনা সম্বন্ধে জড় বিজ্ঞানের অবধারিত জড় প্রকৃতির কোন নিয়মের ব্যতিক্রমের কথা কথিত হইলে, সে ঘটনা অসম্ভব বা বিশ্বাসের অযোগ্য বিবেচনা করা অযৌক্তিক, বিশ্বের বৃহত্তর বিজ্ঞানসম্মত ও নয়। জড়ের ক্রিয়া-প্রণালী অবধারিত করা অপেক্ষা বিশুদ্ধ চৈতন্যের বা আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া-প্রণালী অবধারিত করা সহস্র গুণে কঠিন। জড়ের ক্রিয়া অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করা যায়, চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়া বড় গূঢ় ভাবে হইয়া থাকে—তাহা সামান্য বুদ্ধির অগোচর, বিশুদ্ধ চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতীত তাহার দর্শন লাভ হয় না। তেমন চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। পুরাণ-কারদিগের সে চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। জগতে মহাচৈতন্যের যে গূঢ় গভীর ক্রিয়া চলিতেছে তাহা দেখিবার শক্তি অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাদের ছিল। তাই তাঁহাদের পুরাণ এত অলৌকিক কথায় পরিপূর্ণ। তাই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—প্রহ্লাদ আগুনেও পোড়েন নাই,

জলেও ডোবেন নাই *; রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব এবং সাবিত্রীর পতি সত্যবান মরিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন। জগতের রহস্য তাঁহারা যত দেখিতে পাইতেন আমরা তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাই না। তাঁহাদের যে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টি ছিল, আমাদের তাহা নাই। না থাকিলেও কিন্তু আমাদের এমন শক্তি আছে যদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি যে, জড় প্রকৃতির উপর বা জড়প্রকৃতির সহযোগে মহাচৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়ার ফলে যাহা ঘটে তাহা জড়বিজ্ঞানের মতে বিশ্বাসের অযোগ্য হইতে পারে, লোক সাধারণের বুদ্ধির অতীত মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহাও ব্রতাবলম্বীর অনশনে ক্লিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে বর্দ্ধিত শক্তি লাভ করিবার ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং জগতের সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান সঙ্গত। যাহা সামান্য বুদ্ধির বা স্থূল দৃষ্টির বহির্ভূত তাহাকে অলৌকিক বলে। কিন্তু অলৌকিক হইলেই অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য হয় না। জড় বিজ্ঞান

* শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এক খানি পুস্তক লিখিতেছেন তাহাতে এই শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনার আলোচনা থাকিবে।

জড়ের অতি সামান্য অংশ, উপরিভাগ মাত্র দেখিতে পায়; জড় বিজ্ঞানের দৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ। জড় বিজ্ঞান যাহা দেখিতে পায় না, তাহা অলীক, এমন কথা শুনিতে নাই, এমন কথা শুনা মনুষ্যোচিত নয়, এমন কথা শুনিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। জড় বিজ্ঞানের উপর আর একটা বিজ্ঞান আছে। সে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভেদী—স্থূল, সূক্ষ্ম, জড়, চৈতন্য, জল, স্থল আকাশ, ঊর্দ্ধ, অধঃ, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভেদী। সে বিজ্ঞান বড় কঠিন, বড় ব্যাপক, বড় গূঢ় বিজ্ঞান। মনুষ্য মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিকতায় অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিতে পারেন, সে বিজ্ঞানে তাঁহাদের ভিন্ন আর কাহারও অধিকার হয় না। কিন্তু অপর সকলে তাঁহাদের নিকট সেই বিজ্ঞানের দুই একটী বার্ত্তা শ্রবণ করিলেও কৃতার্থ হইতে পারেন। আমরা সেই আশায় পুরাণকারের কথা শ্রবণ করিতেছি।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং—ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহা জড় বিজ্ঞানাদির সূত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় না এবং লোকে যাহাকে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলিয়া নির্দ্দেশ

করে। এক বাড়ীতে একটী বালকের বসন্ত রোগ হইল। বালকের জননী দিবা রাত্রি সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলেন, তাহার ক্ষতে ঔষধ লেপন করিলেন, ক্ষতের পূয রক্ত স্বহস্তে মুছাইলেন—তাঁহার কিছুই হইল না, কিন্তু পল্লীর পঞ্চাশজন বসন্তে মরিয়া গেল। সন্তানের বসন্ত হইলে জননী, বিশেষতঃ হিন্দু জননী, আহারাদি সম্বন্ধে বড় কঠোর নিয়ম পালন করেন, এক প্রকার অনশন ব্রত গ্রহণ করেন, সর্ব্ববিষয়ে শুদ্ধাচার রক্ষা করেন—সন্তানের জন্য আপনাকে আপনি ভুলিয়া যান, একমনে, এক প্রাণে, সভয়ে, ভক্তিভরে দেবদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। জড়ের ক্রিয়া তাঁহার উপর হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। জড় বিজ্ঞানের সূত্র তাঁহার সম্বন্ধে খাটিতে পারা অসম্ভব বোধ হয়। আহারে আচারে তিনি সাত্ত্বিক, হৃদয়ে ভক্তিমতী, মনে প্রাণে দেবদেবীর কৃপাভিখারিণী—জড়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বড়ই কম—যে সামান্য সম্পর্কটুকু আছে তাহাও সাত্ত্বিক ভাবের, ধর্ম্মানুমোদিত, ধর্ম্মের অনুকূল। জড়বিজ্ঞানের নিয়ম তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইবারই কথা। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে

যাঁহারা মিতাচারী, নিষ্ঠাবান, বিলাসবিদ্বেষী, ধর্ম্মচর্য্যায় রত, মোটের উপর তাঁহারা যত স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন অপরে তত হয় না—ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি ব্যাপক ব্যাধিতে অপরে যত আক্রান্ত হয় তাঁহারা তত হন না—অপরের দেহ যত পীড়াপ্রবণ হইয়া থাকে তাঁহাদের দেহ তত হয় না। ম্যালেরিয়াতে গ্রামের ধনী, দরিদ্র, বালক, যুবা সকলেই মরিয়া গেল—কিন্তু ভট্টাচার্য্য পাড়ার চারি পাঁচ জন ব্যতীত আর কেহই মরিল না। অশীতিপর তর্কভূষণ মহাশয়ের একদিন একটীবার মাথাও ধরিল না! যে দেখিল সেই আশ্চর্য্য—বলিল, অলৌকিক ব্যাপার! অলৌকিক বটে কিন্তু অলৌকিক বলিয়া অবিশ্বাস্য নয়। ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হইলে আহার বিহারাদি সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয় তাহাতে দেহের রোগপ্রবণতা আপনাপনিই কমিয়া যায়। দেহ যেন ব্যাধির দুর্ভেদ্য হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত চিত্তের বিশুদ্ধতা, ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরোপাসনা, জপতপ, সাধুসঙ্গ, লালসাপরিশূন্যতা এই সমস্ত ধার্ম্মিককে জড়ের অধিকার হইতে অনেক দূরে, অনেক উচ্চে লইয়া যায়। ধর্ম্ম যেমন সংরক্ষণের অনুকূল, তেমন আর কিছুই নয়। যাহা ধর্ম্মের

অনুকূল তাহা সংরক্ষণেরও অনুকূল। রোমে যত দিন সংযম, মিতাচার, বিলাসবিদ্বেষ, কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল, রোম ততদিন দিগ্বিজয়ী ছিল। রোমে বিলাস প্রবেশ করিল, রোমের বিশাল সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ধর্ম্মের ন্যায় শক্তি আর নাই। জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিলে যাহা বুঝা যায় না, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়, ধর্ম্মের অসাধারণ শক্তির কথা মনে করিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ থাকে না, অস্বাভাবিকতাও দৃষ্ট হয় না।

ধর্ম্ম যেমন সংরক্ষণের অনুকূল তেমন আর কিছুই নয়। ধার্ম্মিকের বিপদ ঘটে না,ঘটিলেও কাটিয়া যায়। সিলামপুরের মাঝিমাল্লারা বলিত, নাগারামের নৌকা ধর্ম্মের নৌকা, কখন ডুবিবে না। ঝড়ে ধার্ম্মিকের নৌকা ডোবে না, অধার্ম্মিকের নৌকা ডোবে, এ কেমন কথা, এ কি রূপ বিশ্বাস ? ঝড়ের কি চৈতন্য আছে, ঝড় কি জানে—এ ধার্ম্মিক, ও অধার্ম্মিক ? বোধ হয়, না। কিন্তু ঝড় ধার্ম্মিককে চিনুক আর নাই চিনুক, মানব মনের প্রকৃতিভেদে ঝড়ের ক্রিয়া ও ফলের ভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক, ইহা স্বীকার

করিতে হয়। ধর্ম্ম এমনই বস্তু যে উহা মানুষকে ধীর, শান্ত, সংযতচিত্ত,নির্ভীক করে এবং অধর্ম্ম এমনই বস্তু যে উহা মানুষকে ধৈর্য্যহীন, স্থৈর্য্যহীন, অসংযত, অব্যবস্থিতচিত্ত ও ভীরু করিয়া ফেলে। সুতরাং যিনি ধার্ম্মিক ঝড়ে তাঁহার নৌকা রক্ষা করিতে পারিবার অথবা অধিকতর বিপন্ন না করিবারই সম্ভাবনা অধিক, এবং যিনি অধার্ম্মিক ঝড়ে তাঁহার নৌকা ডুবাইয়া ফেলিবার অথবা অধিকতর বিপন্ন করিবারই অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু যে ঝড়ে নদীতে নৌকা ডুবাইয়া দেয়, সংসার পথে মানুষের মাথার উপর দিয়া তদপেক্ষা অনেক বড় বড় ঝড় বহিয়া গিয়া থাকে। সে সব ঝড়ে অধার্ম্মিক ভয়ে বিহ্বল হইয়া বুদ্ধির বিপর্য্যয়ে লণ্ড ভণ্ড হইয়া কোথায় গিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া কি হইয়া যায়, তাহার বর্ণনা হয় না, কিন্তু ধার্ম্মিক অটল, অক্ষত, অনাহত, অবিচলিত থাকেন। সাবিত্রীর উপাখ্যানে মহাভারতকারও সেই কথা বলিয়াছেন। সেই হিংস্রজন্তু সমাকুল, নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্যে পতি সহসা মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন—সাবিত্রী তাহাতে অবিচলিত—ধীরে ধীরে পতির মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া

বসিলেন। তখনি আবার দেখিলেন “রক্তবস্ত্র পরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, প্রশস্তকায়, সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী, শ্যামগৌরবর্ণ, লোহিতলোচন এক ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন।” সাবিত্রীর হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিল বটে; কিন্তু তিনি বিহ্বল বিচলিত হইলেন না, সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই কাল পুরুষের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এত সংযত, এত ধর্ম্মবলসম্পন্ন বলিয়াই ত এমন ঝঞ্ঝাবাতেও সাবিত্রী কালবিজয়িনী হইলেন, মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করাইলেন, আপন শিরোপরি নিক্ষিপ্তপ্রায় বৈধব্য-বজ্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন, শ্বশুর শ্বশ্রূর আসন্ন মৃত্যু নিবারণ করিলেন। যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান, সংযতচিত্ত, ভগবদ্ভক্তিতে ভয়শূন্য বিধাতার বিধানে আস্থাবান, বিপদে তাহার স্থৈর্য্যে ধৈর্য্যে নির্ভীকতায় চিত্তের সংযমে বুদ্ধির বিপর্য্যয়াভাবে সে আপনিও উদ্ধার পায়, যাহার বিপদে তাহার বিপন্ন সেও উদ্ধার পায়। পুত্রের নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্ত দ্যুমৎসেনকে সুবর্চ্চা যে বলিয়াছিলেন, ‘সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, দম ও আচার সংযুক্তা, তাহাতে

সত্যবান নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন’ এবং দালব্যও যে বলিয়াছিলেন ‘সাবিত্রী যখন তাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানের পর আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান নিঃসন্দেহ জীবিত আছেন’ ইহা অর্থশূন্য কথা নয়, অন্তর্দর্শীর অতীব জ্ঞানগর্ভ কথা। আমরাও আমাদের নিত্য সংসার যাত্রায় দেখিতে পাই, যে গৃহস্বামী ধার্ম্মিক, সংযতচিত্ত, স্থিরবুদ্ধি তাঁহার গৃহে কঠিন পীড়া বা অপর বিপদ উপস্থিত হইলে তাহার সহজে শান্তি হয়, অন্য গৃহস্বামীর স্থৈর্য্য ধৈর্য্যের অভাবে, চিত্তের বিক্ষেপে, ভয়বিহ্বলতাজনিত বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে তাদৃশ বিপদ ঘনীভূতই হইয়া থাকে।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং—সংসার রহস্যে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্মই সংরক্ষণের অনুকূল, অধর্ম্মই বিনাশের মূল। অধর্ম্মে মানুষ নষ্ট হয়, জাতি নষ্ট হয়, বড় বড় সাম্রাজ্য নষ্ট হয়—ইহা সকলেই জানেন। পৃথিবীতে অনেক সময় অধর্ম্মকে জয়যুক্ত দেখা যায়। কিন্তু অধর্ম্ম এমনি বস্তু যে উহা ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ অধার্ম্মিককে ত জীর্ণ করিয়া ফেলেই, অপরকেও অধার্ম্মিকের প্রতি প্রতিকূলভাবাপন্ন করিয়া

দেয়। অধর্ম্মের এই দুই প্রকার ক্রিয়ার ফলে অধার্ম্মিকের বিনাশ অনিবার্য্য—দুই দিন অগ্রে হউক, দুই দিন পশ্চাতে হউক, সুনিশ্চিত। অপর পক্ষে, ধার্ম্মিককে কখন কখন বিপুল বিপদ জালে জড়িত হইতে দেখা যায়। অধর্ম্ম শুধু আপনার শত্রু নয়, ধর্ম্মেরও শত্রু। দুষ্টলোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ধার্ম্মিককে বিপন্ন করে। ধার্ম্মিক যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে, দুর্ভেদ্য বিপজ্জাল। ধার্ম্মিকের অপমান, লাঞ্ছনা, নিগ্রহের একশেষ হইতে থাকে। মনে হয়, ধার্ম্মিক গেল, ধনে প্রাণে মজিল, সবংশে ছারখার হইল। কিন্তু বিধাতার সংসাররচনা ধর্ম্মের সূত্রে—সে সূত্র কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া যায় কেহ দেখিতে পায় না, কেহ বুঝিতে পারে না। কে জানে, কেমন করিয়া কোথা হইতে কোন্ প্রবল শক্তি আসিয়া লোক চক্ষের অন্তরালে ধার্ম্মিকের অনুকূলে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, আর দেখিতে দেখিতে ধার্ম্মিকের বিপজ্জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, ধার্ম্মিক যেমন নিরাপদ, নিরঙ্কুশ, নিষ্কলঙ্ক ছিলেন আবার তেমনি হইয়া থাকেন। নিদাঘে কখন কখন দেখা যায়, আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন

হইয়াছে। বায়ু নিরুদ্ধ, গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়িতেছে না,ভয়ে আকাশের কোলে পক্ষী উড়িতেছে না, বসুন্ধরার মূর্ত্তি যেন প্রলয়ঙ্করী। মনে হয় ভীষণ ঝটিকায়, ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে, ভীষণ বরিষণে পৃথিবী রসাতলে যাইবে। কিন্তু কিছুই হয় না। প্রকৃতির অন্তরালে, মানবচক্ষের অগোচরে, নিঃশব্দে কোথায় কোন্ শক্তির ক্রিয়া হয়, আর দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ মেঘ রাশি কোথায় মিলাইয়া যায়—একটু বাতাস উঠে না, মেঘের একটু গর্জ্জন শুনা যায় না, একটী ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না—সেই ভীষণ মেঘরাশি কেমন করিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়, পৃথিবীর ভয়বিভীষিকা ঘুচিয়া যায়, পৃথিবী আবার হাসিতে থাকে। ধার্ম্মিকের বিপদ এমনি করিয়া কাটিয়া যায়, এমনি করিয়া মিলাইয়া যায়। দেখিতে পাওয়া যায় না, কেমন করিয়া কাটে, বুঝিতে পারা যায় না—কেমন করিয়া মিলাইয়া যায়। বহির্জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জগতের ক্রিয়া অধিকতর গূঢ়, অধিকতর প্রচ্ছন্ন, অধিকতর দুর্বোধ। আবার বহির্জগৎ সম্বন্ধে অন্তর্জগতের ক্রিয়া আরো গূঢ়, আরো প্রচ্ছন্ন, আরো দুর্বোধ। যে ঘটনা বহির্জগতের নিয়মানুসারে অস-

ম্ভব বা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ, দুই জগতের সম্মিলিত নিয়মানুসারে তাহা সম্ভব ও স্বাভাবিক হইতে পারে। কেমন করিয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়, আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্নেরা বুঝিতে পারেন, অন্যে বুঝিতে না পারিয়া ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য মনে করে। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি নাই, সুতরাং সাবিত্রীর কথা যতই বুঝিতে চেষ্টা করি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা কেবল এইটুকু বুঝি, উহা অলীক কথা নয়, উহা আধ্যাত্মিকতা-প্রধান যে জগৎ তাহারই কথা। যদি কখন সে জগতে প্রবেশ করিতে পারি তবেই উহা বুঝিতে পারিব, নহিলে আমাদের নিকট উহা দুর্ভেদ্য রহস্যই থাকিয়া যাইবে।

সাবিত্রী যমের হস্ত হইতে মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া আপন বৈধব্য নিবারণ করিলেন, কোন হিন্দু-রই ইহা অসম্ভব বোধ করা উচিত নয়। প্রায়শ্চিত্তে পাপের নাশ হয়, কর্ম্মগুণে কর্ম্মফল নষ্ট হয়, ইহা বড় বিশেষ ভাবেই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ। কর্ম্মফলের অর্থ —পাপপুণ্যের পরিণাম। মানুষের একজন্মের কর্ম্মফল বা পাপ পুণ্যের পরিণাম অন্য জন্মে হইয়া থাকে। এ

জন্মের শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে বা পাপ পুণ্যের পরিণাম রূপে হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্র মতে কর্ম্মফল বা পাপ পুণ্যের পরিণাম অনিবার্য্য, ভোগ করিতেই হইবে। সাবিত্রী পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে বা পাপ পুণ্যের পরিণাম স্বরূপ অকাল বৈধব্যরূপ নিয়তি লইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু সে নিয়তি তিনি খণ্ডন করিয়াছিলেন, অকালে তিনি বিধবা হন নাই। বৈধব্য যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কর্ম্মফলবাদের দুইটী অঙ্গ বা অংশ আছে—(১) কর্ম্মফল অপরিত্যজ্য (২) কর্ম্মফল খণ্ডনীয়। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়, কিন্তু কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মফলের খণ্ডনও হয়। যে শাস্ত্রে মুক্তিবাদ আছে সে শাস্ত্রে কর্ম্মফলখণ্ডনবাদ থাকিবেই থাকিবে—কর্ম্মফল অখণ্ডণীয় হইলে মুক্তিও অসম্ভব হয়। আমরাও সংসার ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে দেখি, মন্দলোকে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া আপন চেষ্টায় সৎপথে আসিয়া সুখী সৌভাগ্যশালী হইতেছে। তাহারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলরূপ দুরদৃষ্ট লইয়া আসে, দুঃখ কষ্টে এবং বহু আয়াসসাধ্য চেষ্টা ও অনুষ্ঠানে সেই কর্ম্মফল ভুগিয়া এবং পূর্ব্ব-

জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই কর্ম্মফল খণ্ডন করে, সেই পাপ বিনষ্ট করে। পুরাণকার এইরূপ কথা কহিয়া থাকেন। ধ্রুব যে অপকৃষ্ট নিয়তি লইয়া উত্তানপাদ রাজার সন্তান রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কত কঠোর তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে তাহা খণ্ডন করিতে হইয়াছিল পুরাণকারের মুখে তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু সেই অমানুষিক চেষ্টায় সে নিয়তি খণ্ডিত হইয়াছিল। একটি মিথ্যা কথা কহিবার ফল স্বরূপ যুধিষ্ঠিরকে কত দিন ধরিয়া কত মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, মহাভারতের মহাকবি তাহা জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যুধিষ্ঠির স্বর্গে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। মহাভারতকার সাবিত্রীর উপাখ্যানেও সেই কথা কহিয়াছেন। সাবিত্রী পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে সাংঘাতিক নিয়তি লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অদৃষ্টে কি বিষম নিয়তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদের নিকট তাহা জানিতে পারেন। তেমন কথা শুনিলে, পতিব্রতার প্রাণ কি হইয়া উঠে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়।

কিন্তু যান সত্যবান যাইবেন, হই বিধবা হইব, তাঁহাকে যখন মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তাঁহাকেই বিবাহ করিব,এই ভীষণ সঙ্কল্প করিয়া সাবিত্রী এক দিন নয়, দুই দিন নয়, দশ দিন নয়, পূর্ণ এক বৎসর কাল, কি পতি, কি শ্বশুর, কি শ্বশ্রূ কাহাকেও সেই বিষম কথা না বলিয়া, ঘুণাক্ষরেও জানিতে না দিয়া, অসাধারণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, সংযম সহকারে সেই অসহনীয় দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইবার পর সেই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া কালপুরুষের সহিত তেমন অলোকসামান্য সাহস, অসীম অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাহাতেই ত তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল খণ্ডিত হয়,—তাঁহার নিয়তিনির্দ্দিষ্ট অকাল বৈধব্য ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু কত তেজস্বিতা, কত আত্মসংযম, কত দৃঢ়চিত্ততা, কত ধর্ম্মপ্রাণতা, কত আধ্যাত্মিক শক্তি থাকিলে তবে এমন যন্ত্রণা এমন করিয়া এত দীর্ঘকাল ভোগ করিবার পর আবার এমন কঠিন এমন বিস্ময়কর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারা যায়, বোধ হয় তত্ত্বজ্ঞ অন্তর্দর্শীরাই তাহা জানেন, আমরা তাহার সম্যক

উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু হইবে, নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া পিতা অশ্বপতি যখন কন্যাকে অন্য পতি মনোনীত করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন সাবিত্রী যে ভাবে এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন—

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

অর্থাৎ

অংশ, অর্থাৎ পৈতৃকাদি বিষয়ের বিভাগনির্ণায়িকা গুটিকা একবার নিপতিত হয়; লোকে কন্যাকে একবার প্রদান করে, এবং 'দান করিলাম' একথাও একবার বলে, এই তিন বিষয় এক এক বারই হইয়া থাকে। অতএব আমি একবার যাঁহারে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন, বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে বরণ করিতে পারিব না। —তাহাতে অশ্বপতি বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারেন

নাই, কিন্তু অন্তর্দর্শী নারদ বুঝিয়াছিলেন, সাবিত্রী সামান্যা নারী নহেন। তিনি অশ্বপতিকে বলিলেন—

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ! সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব।
নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্ম্মাদস্মাৎ কথঞ্চন॥

* *

অবিঘ্নমস্তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব।

অর্থাৎ

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা। এই সতীত্বধর্ম্ম হইতে ইহাঁরে কোন ক্রমে নিবারিত করিতে পারা যাইবে না। * * * * তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয়।

নারদ বুঝিয়াছিলেন, নিয়তি খণ্ডন করিতে যে অসাধারণ মানসিক বল ও আধ্যাত্মিক শক্তি আবশ্যক সাবিত্রীর তাহা আছে—তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাবিত্রী মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করাইয়া আপন অকাল বৈধব্য নিবারণ করিতে পারিবেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অশ্বপতিকে বলিয়া গিয়াছিলেন—অবিঘ্নমস্তু

সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব—আপনি নির্ব্বিঘ্নে সত্যবানকে কন্যা দান করুন।

সাবিত্রীর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিই সাবিত্রী কথার প্রকৃত অলৌকিকতা। সাবিত্রীকে বুঝিয়া উঠা আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের অসম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়।

সাবিত্রী।

সাবিত্রী অশরীরী। তাঁহার শরীরের শারীর ধর্ম্ম ছিল না বলিলেই হয়।

তাঁহার শরীর ষোলকলায় পূর্ণ ছিল—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই সুন্দরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সুগঠিত সুপরিস্ফুট ছিল।

তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সংমেনিরে জনাঃ॥

অর্থাৎ

সেই বিশাল নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে, ইনি

দেবকন্যা, মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন, এইরূপ জ্ঞান করিতে লাগিল।

এমন যে দেহ, যৌবনের প্রারম্ভেই ইহাতে চিন্তারূপ কীট প্রবেশ করিল। সেই দুরন্ত কীট ক্ষুরধার দন্তে এক বৎসর কাল দিবানিশি সেই স্বর্ণকান্তি সুকোমল দেহের মর্ম্মস্থল কাটিল। তাহার পর সেই দেহে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস—সেই দেহে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত গেল না। তখন সে দেহ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইল। সে দেহ দেখিয়া সাবিত্রীর শ্বশুর শ্বশ্রূ ভীত ও ভাবিত হইলেন—কাতর বাক্যে তাঁহাকে ব্রত ভঙ্গ করিতে বলিলেন। তিনি কিন্তু তখনও দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন—

(১)

ন কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্॥

অর্থাৎ

হে তাত! আপনি সন্তাপ করিবেন না, আমি ব্রত সমাপ্ত করিতে পারিব। ব্রত সমাপ্তির কারণ কেবল নিশ্চল উৎসাহ, আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন করিয়াছি।

বৎসরব্যাপী বিষম চিন্তায় জর্জ্জরিত দেহে উপর্য্যুপরি তিন দিন তিন রাত্রি বিন্দুমাত্র জল পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়াও সাবিত্রীর ব্রতপালনে এই 'অবিচলিত উৎসাহ'! এমনি উৎসাহ যে শ্বশুর শ্বশ্রূ অধিকতর কাতর হইয়া যখন তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন তখনও তিনি তেমনি দৃঢ়তা সহকারে বলিলেনঃ—

অস্তংগতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাম্যয়া।
এব হে হৃদি সংকল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া॥

অর্থাৎ

এই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমি অন্তঃকরণে এই সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সূর্য্য অস্তগত হইলে আহার করিব।

কাঠের পুতুলটী হইয়াছেন, তথাপি সাবিত্রীর 'সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা' সমান রহিয়াছে। বনগমনকালে সত্যবান তাঁহাকে বলিলেন—তুমি আর কখন বনে যাও নাই, বনের পথ অতি ক্লেশকর, আবার উপবাস করিয়া তুমি কাহিল হইয়া পড়িয়াছ, তুমি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না। তিনি কিন্তু উত্তর করিলেন—উপবাস করিয়া আমি কাহিল হই নাই। শরীরে

কিছুমাত্র অসুখ বোধ করি নাই, তোমার সহিত বনে যাইতে আমার অতিশয় ইচ্ছা ও আগ্রহ হইতেছে—

বনং ন গত পূর্ব্বং তে দুঃখঃ পন্থাশ্চ ভাবিনি।
ব্রতোপবাসক্ষামা চ কথং পদ্ভ্যাং গমিষ্যসি॥

সাবিত্র্যুবাচ।

উপবাসান্ন মে গ্লানিনাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ।
গমানোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্॥

এই সমস্ত দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আরও অবাক হইতে হয়, মৃতপতিকে কোলে করিয়া সেই মহারণ্যে মহাকালের আগমনে কাঠের পুতুলটী যাহা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া। কাঠের পুতুলটী মহাকালকে দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হন নাই, মহাকালকে অবিচলিত ভাবে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া ছিলেন, মহাকালের নিষেধ সত্ত্বেও অদম্য উৎসাহ ও মহা তেজস্বিতা সহকারে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রান্তির আশঙ্কা করিয়া মহাকাল যতবার তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন,

ততবারই তিনি দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—

যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ম্বা যত্রগচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
তপস্যা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্ব্রতেন চ।
তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥

অর্থাৎ

আমার স্বামী যেস্থানে নীত হইতেছেন এবং আপনিও যেস্থানে গমন করিতেছেন, আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ, ব্রত ও আপনকার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে।

মহাকাল যখন বলিলেন—তুমি বহু দূর পথ আসিয়াছ, এইবার ফিরিয়া যাও—তখন কাঠের পুতুলটী মহাকালকে যেন একটু লজ্জা দিবার, একটু শাসাইয়া দিবার জন্য উত্তর করিলেন—

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসন্নিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।

অর্থাৎ

স্বামীর নিকটে থাকায় আমার এ দূর বোধ

হইতেছে না ; আমার মন ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দূর প্রদেশে প্রধাবিত হইতেছে।

তাহার পর কাঠের পুতুল কেমন করিয়া মহাকালের সহিত বহুদূর গিয়া বহু কথা কহিয়া বহু আয়াসে মৃতপতিকে পুনর্জীবিত করাইয়া সেই রাত্রেই পতির দেহভার আপন স্কন্ধ ও বাহুতে বহন করিয়া সেই মহারণ্য ভেদ করিয়া মৃতকল্প শ্বশুর শ্বশ্রূর কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহা কথিত হইয়াছে।* এই যে কাঠের পুতুলটী, ইহা প্রকৃত পক্ষেই কাঠের পুতুল—ইহাতে রক্ত মাংস ছিল না। সাবিত্রীর শরীর ছিল, 'কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়' শরীর ছিল—কিন্তু সে শরীর শারীরধর্ম্মের অধীন ছিল না। এই জন্যই বলিতেছি— সাবিত্রী অশরীরী।

সাবিত্রী অশরীরী, কেন না তিনি মনোময়ী, তিনি চিন্ময়ী। সাবিত্রীর শরীরের অনুপম শোভা ও সৌন্দর্য্য। 'সেই বিশাল-নিতম্বিনী সুমধ্যমাকে কাঞ্চনময়ী-প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া' লোকে মনে করিত; 'ইনি দেবকন্যা, মানবী হইয়া অবনীতে

* চতুর্থ অধ্যায়।

অবতীর্ণা হইয়াছেন। রূপে সাবিত্রী অতুলনীয়া, কিন্তু তিনি মনোময়ী—জানিতেন না যে তাঁহার রূপ অতুলনীয়, দেখিতে তিনি 'কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়'। জানিলে, দুঃস্থ দরিদ্র দ্যুমৎসেনের বধূ হইয়াও তিনি পিতৃপ্রদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া বল্কল কাষায় পরিধান করিতেন না,* পরিধান করিতে পারিতেনও না। তিনি যে রূপবতী, এ জ্ঞানই তাঁহার ছিল না। রূপ আছে, এই জ্ঞান থাকিলে, রূপের অভিমান, রূপের গর্ব্ব, রূপের মোহ থাকিবেই থাকিবে। সাবিত্রীর এ সকল কিছুই ছিল না। তিনি যে অশরীরী ছিলেন। অশরীরীর রূপের অভিমান ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মের অভিমান ছিল। সত্যবান পুনর্জীবন লাভ করিয়া পিতামাতার চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলে, ধর্ম্মরূপিণী তাঁহাকে এই কথা বলিয়া বুঝাইয়াছিলেনঃ—

যদিমেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি।
শ্বশ্রূশ্বশুরভর্ত্তৃণাং মম পুণ্যাস্তু শর্ব্বরী॥
নস্মরাম্যুক্তপূর্ব্বাং বৈ স্বৈরেষ্বপ্যনৃতাং গিরম্।
তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম॥

* তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ

যদি আমার তপস্যা, দান বা হোম করা থাকে, তাহা হইলে আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে এই শর্ব্বরী কল্যাণকরী হউক। পূর্ব্বে আমি পরিহাস চ্ছলেও কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না। সেই সত্য দ্বারা আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর জীবিত থাকুন।

সাবিত্রী যথার্থ ই অশরীরী, যথার্থ ই মনোময়ী।

সাবিত্রী যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, 'বিশাল নিতম্বিনী' হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার যৌবনের বিপুল বিকাশ দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহের জন্য মহাচিন্তাকুল, অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কন্যাকে বরান্বেষণে তৎপর হইতে বলিলেন—পাছে বিবাহে বিলম্ব হইলে প্রাপ্ত যৌবনার. যৌবন জনিত কোন রূপ বিকার ঘটে। যুবতী সাবিত্রী বরান্বেষণে বহির্গত হইলেন—কিন্তু যৌবন মদে উন্মত্তার ন্যায় বহির্গত হইলেন না, অশরীরী ধর্ম্মরূপিণীর ন্যায় বহির্গত হইলেন।* বর মনোনীত করিয়া আসিয়া

* চতুর্থ অধ্যায়।

স্ফূরিতযৌবনা দেবর্ষি নারদের নিকট শুনিলেন যে যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিয়া আসিয়াছেন, এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অন্য পুরুষ মনোনীত করিতে বলিলেন। তিনি দৃঢ়তাসহকারে উত্তর করিলেন ঃ—

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নিগুর্ণোঽপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

অর্থাৎ

আমি একবার যাঁহারে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহা ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে আর বরণ করিতে পারি না।

দীর্ঘায়ুরথবল্পায়ুঃ—দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর পতিরূপে বরণ করিতে পারিব না—কথা বিষম দৃঢ়তা সূচক। কথা শুনিয়া স্বয়ং নারদ অশ্বপতিকে বলিলেনঃ—

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব।
নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্ম্মাদস্মাৎ কথঞ্চন॥

অর্থাৎ

তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা ; এই

সতীত্বধর্ম্ম হইতে ইহারে কোন প্রকারে নিবারিত করিতে পারা যাইবে না।

নারদই সত্যবানের বিধিলিপির বিষয় জ্ঞাত থাকিয়া সাবিত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সেই সময় অশ্বপতির সভায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীর দৃঢ়তা দেখিয়া বিবাহ নিবারণ করিতে আসিয়া তিনিই বিবাহে অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন। সাবিত্রীর কথার অর্থ কি? অর্থ এই—আমি যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন, তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিব না—অর্থাৎ, সত্যবানকে বিবাহ করিয়া যদি আমাকে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তাহাও করিব, তথাপি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। স্ফূরিতযৌবনা 'বিশাল-নিতম্বিনীর' মুখে এমন দৃঢ়তা সহকারে কথিত এরূপ কথার অর্থ এই যে, স্ফূরিতযৌবনা জানেন না যে তিনি স্ফূরিতযৌবনা, 'বিশাল-নিতম্বিনী'। যে রমণী আপনাকে স্ফূরিতযৌবনা ও 'বিশাল নিতম্বিনী' বলিয়া অনুভব করেন সে রমণীর মন

বৈধব্যের নামে শিহরিয়া উঠে, বৈধব্যের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়। সাবিত্রী তেমন রমণী হইলে, নারদের মুখে সত্যবানের বিধিলিপির কথা শুনিয়া বৈধব্যের ভয়ে ভীতা হইয়া অন্য পতি মনোনীত করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতার আদেশ পালন করিতেন, মনোময়ীর ন্যায় কখনই বলিতে পারিতেন না :—

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥

অর্থাৎ

মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে এবং পরিশেষে কর্ম্মদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।

সাবিত্রীর নিকট মনই প্রধান, বৈধব্যের ভয়ে তিনি সে মনের বিনাশ বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারেন নাই। তিনি শরীরী হইয়াও প্রকৃতপক্ষে অশরীরী; তাঁহার মতন অশরীরীর মনে শরীরের ভাবনার উদয়ই হয় না। মনোনীত পুরুষ এক বৎসরান্তে কালগ্রাসে পতিত হইবেন শুনিয়া তিনি বলিবেন না ত কে বলিবে?—

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ূঃ সগুণো নিগুর্ণোহপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

সাবিত্রী স্ফূরিতযৌবনা হইয়াও স্ফূরিতযৌবনা নহেন, 'বিশালনিতম্বিনী' হইয়াও বিশালনিতম্বিনী নহেন, এক কথায় শরীরী হইয়াও শরীরী নহেন। সাবিত্রী মনোময়ী—সাবিত্রী চিন্ময়ী।

মনোময়ীর মনের কি শক্তি, চিন্ময়ীর চিত্তের কি গাম্ভীর্য্যও গভীরতা! বিবাহের পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন—এক বৎসর পরে পতি কালগ্রাসে পতিত হইবেন। মনোময়ী কেমন পতিব্রতা তাহা ত দেখা হইয়াছে *। যে রমণীর সাবিত্রীর ন্যায় সতীত্ব, সাবিত্রীর ন্যায় পতিপ্রেম এবং সাবিত্রীর ন্যায় পাতিব্রত্য, এক বৎসর পরে পতির মৃত্যু অনিবার্য্য জানিলে, তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন। মহাভারতকার বলিয়াছেন—নারদ যে সাংঘাতিক কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, এক বৎসর কাল সাবিত্রীর মনে তাহা দিবানিশি জাগরূক ছিল—কি শয়নে, কি উপবেশনে, কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

* চতুর্থ অধ্যায়।

সাবিত্র্যাস্তু শয়নায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাশ্চ দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্বাক্যং মনসি বর্ত্ততে ॥

দশ দিন এমন দুর্ভাবনায় থাকিলে, কত রমণী পাগল হইয়া যায়, কেহ হয়ত আপন প্রাণ আপনি নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু সাবিত্রীর মানসিক শক্তি অতি অসাধারণ। তাঁহার পতি এক বৎসর পরে মরিবেন, এ কথা তাঁহার শ্বশুর গৃহে কেহই জানিতেন না, সত্যবান পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। সাবিত্রী যদি সামান্যা নারী হইতেন, তাহা হইলে তিনি মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই এক প্রকার বুঝিয়া ফেলিত। তিনি বড় শক্ত হইলেও অন্ততঃ তাঁহার পতিকে বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সাবিত্রী সেই সাংঘাতিক কথা পতিকে পর্য্যন্ত বলেন নাই। তাঁহার মনে যে তেমন সাংঘাতিক কথা, সাংঘাতিক ব্যথা ছিল, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতিকে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে দেন নাই। সেই সাংঘাতিক কথা মনে লুকাইয়া রাখিয়া, সেই মর্ম্মান্তিক ব্যথায় কিছু মাত্র বিচলিত প্রতীয়মানা না হইয়া, তিনি শ্বশুর.শ্বশ্রূ পতি এবং অপর সকলের

এমনি সেবা শুশ্রূষা ও তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার মনে দুশ্চিন্তার লেশ মাত্র ছিল না, অন্তরে কোন ব্যথাই স্থান পায় নাই।

পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশয়েণ দমেন চ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাদধে॥
শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্ব্বাচঃ সংযমনেন চ॥
তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ।

এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আজ সেই ভীষণ দিন। সন্ধ্যা আগত প্রায়—সেই ভীষণ মুহূর্ত্তও আগত প্রায়। পতির সহিত পতিব্রতা বনে প্রবেশ করিয়াছেন। সাবিত্রীর হৃদয় তখন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, 'হৃদয়েন বিদূয়তা', বিদীর্ণ হইবারই কথা, তথাপি তিনি হাসিতে হাসিতে যাইতেছিলেন, 'হসন্তীব'! সত্যবান কিছুই জানিতেন না, সাবিত্রী তখনও তাঁহাকে কিছু বলেন নাই, তিনি বনের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া সাবিত্রীকে 'পুণ্যজননী নদী ও পুষ্পিত শৈলোত্তম সমস্ত" দেখিতে বলিলেন। সাবিত্রীর তখন বনশোভা দেখিবার সময় নয়, তাঁহার তখন মনে

হইতেছে, যেন পতির মৃত্যু হইয়া গিয়াছে—মৃতমেব হি তং মেনে কালে—তথাপি তিনি আপন হৃদয়কে যেন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের ভাবনা লুকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অপর ভাগে আনন্দের সৃষ্টি করিয়া পতির সহিত অরণ্যের রমণীয়তার কথা কহিতে লাগিলেন!

অনুব্রজন্তী ভর্ত্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী॥

এ মনের শক্তি সামর্থ্য ও পরিসর—এ চিত্তের বিশুদ্ধতা, বিকারবিহীনতা ও গভীরতা—সমস্তই কল্পনাতীত। ইহার কিছুরই আমাদের ধারণা হয় না।

কিন্তু এ মনের আরো শক্তি, আরো সামর্থ্য, আরো পরিসর মহাভারতের মহাকবি দেখাইয়াছেন। এতক্ষণ যাহা দেখা গেল তাহা দিবালোকে বনের শোভা দেখিতে দেখিতে সুস্থ বলিষ্ঠ আনন্দোৎফুল্ল সত্যবানের সঙ্গে থাকিয়া দেখা গেল। এইবার বড় ভিন্ন রূপ, বড় বিপরীত প্রকার দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে—দিবালোক চলিয়া গিয়াছে, মহারণ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে, সত্যবান সহসা মহা-

নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। নারদ কথিত সেই ভীষণতম মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, সাবিত্রী দেখিলেন—যাঁহার নামে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপে সেই 'রক্তবস্ত্রপরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, দীর্ঘকায় লোহিতলোচন ভয়ঙ্কর পুরুষ' তাঁহারই পতিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান। তথাপি তিনি যেমন তেমনি! সম্মুখে,ভীষণতার ভীষণতম মূর্ত্তি,চারিপার্শ্বে ভীষণতার ভীষণতম সমাবেশ, তথাপি তিনি যেমন তেমনি! তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কাঁপিয়া উঠিবারই কথা, ভাঙ্গিয়া যায় নাই ইহাই আশ্চর্য্য,অন্য হৃদয় হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি কিন্তু আপনাতে আপনি এমনি সংযত যে, তৎক্ষণাৎ উঠিতে হইবে, তথাপি ভয়ে পতির মস্তক ক্রোড় হইতে ফেলিয়া না দিয়া, পাছে তাহাতে এতটুকু আঘাত লাগে এই জন্য ধীরে, অতি ধীরে তাহা নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যস্য শনৈঃ শিরঃ।

ধীরে, অতি ধীরে—তখনও ধীরে, অতি ধীরে—স্বামী সহসা কালনিদ্রাভিভূত, সহসা সম্মুখে মহাকাল—তথাপি ধীরে, অতি ধীরে—এ কি

ব্যাপার! এ কি কাণ্ড! মানুষের মনে ইহার ধ্যান ধারণা হয় না!

সাবিত্রী যেমন মনোময়ী, যেমন চিন্ময়ী, তেমনি জ্ঞানময়ী। তাঁহার যে প্রকৃতির মন, তাঁহার যে প্রকৃতির চিত্ত, তাহাই জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধার, জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানোন্মেষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগা। যেখানে শরীর প্রবল সেখানে মন বা চিত্তে জ্ঞানোন্মেষ কঠিন হয়; যেখানে শরীর অ-প্রবল সেখানে মনে বা চিত্তে জ্ঞানোন্মেষ সহজ ও স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়াদির দমন যে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিবার প্রথম প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠান স্বরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থই এই। সাবিত্রী অশরীরী, সুতরাং তাঁহার মন বা চিত্ত জ্ঞানোন্মেষের প্রশস্ততম ক্ষেত্র, জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্ট লীলা স্থল। যমের সহিত কথোপকথনে তাঁহার জ্ঞানের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, সূক্ষ্মতা এবং গভীরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। যমের ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি বিভোর। সাবিত্রী সেই যমকে জ্ঞানের কথায় মোহিত করিয়া, জ্ঞানের কথায় উন্মত্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অমূল্য বর

লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার একটী কথা শুনিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপী যম বলিয়াছিলেন, তুমি যেরূপ কথা বলিলে সেরূপ কথা আর কাহারো কাছে শুনি নাই —উদাহৃতং তে বচনং যদঙ্গনে শুভে ন তাদৃক্ ত্বদৃতে শ্রুতং ময়া। জ্ঞানময়ীর জ্ঞানের কত উচ্চতা, গভীরতা ও পবিত্রতা, যমকে তিনি যে সকল কথা বলিয়া-ছিলেন, বেদব্যাসের মহাগ্রন্থে তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তন্মধ্যে একটী মাত্র কথা—সাধুর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্যবিষয়ক—একটী মাত্র কথা এ স্থলে উদ্ধৃত করিব—

সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ॥
সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্ সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ॥
আর্য্যজুষ্টমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতম্।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বাণা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্॥
ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো ন চাপ্যর্থো নশ্যতি নাপি মানঃ।
যস্মাদেতন্নিয়তং সৎসু নিত্যং তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি॥

অর্থাৎ

সাধুলোকদিগের সনাতন ধর্ম্মেতেই সদাকাল আসক্তি থাকে ; সাধুলোকেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না ; সাধুলোকদিগের সাধুসঙ্গ কদাচ নিস্ফল হয় না এবং সাধুলোকেরা সাধুসকল হইতে ভয় সম্ভাবনাও করেন না। হে রাজন্! সাধুরাই সত্যপ্রভাবে সূর্য্যকে পরিচালিত করেন ; সাধুরাই তপোবলে পৃথিবীকে ধারণ করেন ; সাধুরাই প্রাণিগণের কল্যাণের গতি ; অতএব সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া সজ্জনেরা অবসন্ন হন না। এই চিরন্তন ব্যবহার আর্য্যগণের আচরিত, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া সাধুরা পরার্থসাধন করত প্রত্যুপকারের প্রতীক্ষা করেন না। সৎপুরুষ সকলেতে প্রসাদ ব্যর্থ হয় না, কার্য্য নষ্ট হয় না এবং মানেরও হানি হয় না ; সাধুগণেতে এই নিয়ম যখন নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন সাধুরাই রক্ষা কর্ত্তা হন।

সাবিত্রী তেজোময়ী। তাঁহার তেজস্বিতার কথা মহাকবি কিছু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—বলিয়াছেন যে তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সাহস করে নাই—

তাস্তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবাধিতঃ॥

আমাদের এখনকার বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদিগকে তেজ শব্দটা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এ মেয়েটার বড় তেজ, ও বউটার তেজের সীমা নাই—আমাদের অন্তঃপুরে এইরূপ মন্তব্যের এখন বড়ই বাহুল্য হইয়াছে। কিন্তু কেহ যেন সিদ্ধান্ত না করেন—আমাদের ঘরে ঘরে সাবিত্রীরও বাহুল্য হইয়াছে। পতির প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার মনে ধরিল না, বাঙ্গালীর বধূ নাক সিটকাইয়া পা দিয়া তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—শ্বশুর শ্বাশুড়ী সংসারের হিতার্থ একটা উপদেশ দিলেন, বধূমাতা শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে কট্ কট্ করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিয়া ঝনাৎ করিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু আমাদের সেই সেকালের সাবিত্রীর তেজ যে এই প্রকার তেজ ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে মহাভারতে তাহার কোন প্রমাণই নাই। মহাভারতকার বলিয়াছেন —সাবিত্রীর রূপের গর্ব্ব, পিতৃধনের গর্ব্ব কিছুই ছিল না, দরিদ্রের বধূ হইয়াই তিনি পিতৃপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া বল্কলকাষায় পরিধান

করিয়াছিলেন ; শ্বশুর শ্বাশুড়ীর যেমন সেবা করিতে হয় সাবিত্রী তাঁহাদের তেমনি সেবা করিতেন ; পতির যেমন করিয়া প্রীতি সাধন করিতে হয় সাবিত্রী তেমনি করিয়া তাঁহার প্রীতি সাধন করিতেন ; শুধু আপন শ্বশুর শ্বশ্রূ ও পতি নয়, আশ্রম প্রদেশে অপর যাঁহারা ছিলেন, সাবিত্রী তাঁহাদের প্রত্যেকের 'অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা' 'তুষ্টি সম্পাদন' করিতেন। সাবিত্রী অপূর্ব্ব বিনয়ের সহিত সকলের সহিত কথা কহিতেন। সাবিত্রীকে আশ্রম প্রদেশের সকলেই ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। আর সেই সত্যযুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতভূমে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিয়াছে এবং ভাল বাসিয়াছে। গুরুজনের নিকট সাবিত্রী সম্ভ্রম ও নম্রতার আদর্শরূপিণী। পিতার নিকট আসিয়া তিনি তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া যোড়হস্তে একটী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন—

> সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ শেষাঃ পূর্ব্বং নিবেদ্য চ।
> কৃতাঞ্জলির্ব্বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমাস্থিতা ॥

কিন্তু সেই পিতা যখন তাঁহাকে অন্য বর অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি এক অন্তর্নিহিত

শক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া গম্ভীরভাবে দৃঢ়তাসহকারে উত্তর করিয়াছিলেন—আমি যাঁহাকে একবার পতিরূপে বরণ করিয়াছি তিনি দীর্ঘজীবী হউন আর নাই হউন, গুণবান হউন আর নাই হউন, তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বরণ করিব না। ইহাই প্রকৃত তেজ। এ তেজের উৎপত্তি ধর্ম্মে। এখনকার বাঙ্গালীর মেয়ের তেজের যে সমস্ত লক্ষণ, সাবিত্রীতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সাবিত্রীর যে তেজ বা তেজস্বিতার কথা মহাভারতকার বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন, তাহার নিদর্শন অতি অপূর্ব্ব। কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠা, অসাধারণ মানসিক একাগ্রতা, বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা, দেখিয়া ত্রিভুবন স্তম্ভিত হয়। এমন নির্ভীকতা, অতুলনীয় পাতিব্রত্য—ইহাই সাবিত্রীর তেজস্বিতার নিদর্শন। শেষোক্ত নিদর্শনের কথা একটু বলি। সত্যবানের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া যাইতে যাইতে যম যতবার সাবিত্রীকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, ততবারই সাবিত্রী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া দৃঢ়তা সহকারে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। প্রথমবারের অনুরোধে তিনি বলিয়াছিলেন

—আমার স্বামী এবং আপনি যে স্থানে যাইতেছেন ধর্ম্মানুসারে আমারও সেই স্থানে যাওয়া কর্ত্তব্য; আমার পতি যে স্থানে যাইতেছেন তপস্যা, গুরু-ভক্তি, পতিস্নেহ প্রভৃতির বলে আমি তথায় যাইবই যাইব—

> যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
> ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃসনাতনঃ ॥
> তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্ব্রতেন চ।
> তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতি ॥

'আপনার অনুগ্রহে আমার গতি অপ্রতিহত হইবে'—এই যে যমের অনুগ্রহের কথা, ইহা সাবিত্রীর তেমন মনের কথা নয়—তাঁহার মনের কথা,—আমার তপস্যা, গুরুভক্তি ও পাতিব্রত্যের বলে আমি যাইব, যম আমার গতি রোধ করিতে পারিবেন না। তবে আবার যে যমের অনুগ্রহের কথাও বলিয়াছেন, সে তাঁহার তেজস্বিতার সহিত যে অপূর্ব্ব নম্রতা ও শিষ্টতা মিশ্রিত ছিল তাহারই রমণীয় নিদর্শন।

যম একটী একটী করিয়া তিন চারিটী বর দিয়াছিলেন। যখনই সাবিত্রীকে বর ভিক্ষা করিতে

বলিয়াছিলেন, তখনই মৃত পতির জীবন ভিন্ন অন্য বর চাহিতে বলিয়াছিলেন। শেষে কিন্তু তাঁহাকে সেই মৃত পতির জীবন পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছিল—সাবিত্রীর অপূর্ব্ব পাতিব্রত্যের হুঙ্কারে এক প্রকার অভিভূত হইয়া পতিব্রতাকে তাঁহার মৃত পতির জীবন দান করিতে হইয়াছিল। এই সে হুঙ্কার—

নতেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্বিনা কৃতস্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং যথা মৃতা হ্যেবমহং পতিং বিনা॥
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং না কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
না কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্॥
বরাতিসর্গঃ শত পুত্রতা মম ত্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ

হে মানপ্রদ! আপনি আমার পুণ্য ব্যতিরেকে যেমন অন্য অন্য বর প্রদান করেন নাই, সেইরূপ এই বরটীও পুণ্যব্যতিরেকে প্রদান করিতেছেন না; অতএব আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, এই সত্যবান জীবিত হউন, যেহেতু পতি ব্যতিরেকে আমি মৃতার ন্যায় রহিয়াছি। আমি পতি-বিহীনা হইয়া সুখ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া ঐশ্বর্য্য

কামনা করি না, পতি বিহীনা হইয়া জীবনধারণেও উৎসাহ করিতে পারিনা। দেখুন, আপনিই আমায় শতপুত্র হইবার বর প্রদান করিলেন, অথচ আমার পতিকে হরিয়া লইয়া যাইতেছেন; অতএব আমি বর প্রার্থনা করিতেছি, এই সত্যবান জীবিত হউন, তাহাতে আপনকারই বাক্য সত্য হইবে।

বড় মিষ্ট কিন্তু বড় শক্ত তিরস্কার। এ মেয়ের পাতিব্রত্যের কি তেজ! এই সকল কারণেই বলিতে হইয়াছে,স্বয়ং সাবিত্রীই সাবিত্রীর উপাখ্যানের প্রকৃত অলৌকিকত্ব।

সাবিত্রী অশরীরী—তিনি মানবজগতের অত্যুচ্চ স্তরবাসিনী। সে স্তরে আর কেহ আছেন কি না, যদি থাকেন, কে কে আছেন, এস্থলে তাহা ঠিক করিতে পারিব না—তাহা ঠিক করিবার স্থান ইহা নহে। কিন্তু মানবজগতের উচ্চতম স্তরে থাকিয়াও সাবিত্রী মানবজগতের সংসার রূপ নিম্ন স্তরে আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে পরম ধর্ম্মসাধন জ্ঞানে মিশাইয়া রাখিয়াছিলেন। সংসারে তিনি সর্ব্বলোকের সুখ সন্তোষ বিধায়িনী, শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির শুশ্রূষাকারিণী এবং শ্বশুরকুল, পিতৃকুল ও পতির

রক্ষাকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতির কথা মহাভারতকার অতি সংক্ষেপে—দুই তিনটী মাত্র শ্লোক—বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে গুরুজনের সেবা এবং সকলের তুষ্টিসাধন অতি গুরুতর কর্ত্তব্য বুঝিয়া সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে তাহাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ বড় সুন্দর আত্মোৎসর্গ। যেখানে মন বড় উচ্চ সেই খানেই সংসারে এইরূপ আত্মোৎসর্গ হইয়া থাকে। মানবজগতের উচ্চস্তরের জন্যই উহার নিম্নস্তর মনুষ্যের বাসের উপযোগী হয়, পবিত্রতা-পরিবর্দ্ধক পবিত্র আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পরিপূরিত হয়, মনুষ্যের উন্নতির সোপান স্বরূপ হয়, নচেৎ ঐ নিম্নস্তর হিংস্র শ্বাপদ পিশাচাদি অধিকৃত স্তরের সমান হইয়া পড়ে। মানবজগতের উচ্চতম ও নিম্নতম স্তরের সংযোগ অত্যাবশ্যক। ঐ দুই স্তরের সংযোগ সম্মিলন ও সংমিশ্রণেই মানবজগতের সম্পূর্ণতা। সাবিত্রী ব্রহ্মার পূর্ণ সৃষ্টি।

ব্রহ্মার পূর্ণ সৃষ্টি বলিয়াই সাবিত্রী সংসারে পূর্ণতা সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই অলোকসামান্য গুণে তাঁহার শ্বশুরকুল বিপদমুক্ত

হইয়া রক্ষিত ও হৃতরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহারই শুভকারিতায় তাঁহার পিতৃকুল রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহারই অসীম আয়াসে তাঁহার পতি মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। সংসার করিবার দোষে নারীই সংসার নষ্ট করেন। সংসার করিবার গুণে নারীই সংসার রক্ষা করেন। যে নারী আপনারে ভুলিয়া সংসারের ভাবনা যত ভাবেন, সংসারের সেবায় যত আত্মোৎসর্গ করেন, অভাবে অনটনে আপদে বিপদে তিনি তত সংসার রক্ষা করিতে পারেন। সংসারে সাবিত্রী সকল দিক রক্ষা করিয়াছিলেন। সাবিত্রী সংসাররূপিণী।

সংসারে পতির সহিত নারীর যে রূপ সম্বন্ধ অপর কাহারো সহিত সে রূপ নয়। পতির সহিত নারীর সম্বন্ধের গূঢ়ত্বের, গাঢ়ত্বের গভীরতার, বিশেষত্বের পরিমাণও হয় না, বর্ণনাও হয় না। সেই গূঢ়ত্ব, গাঢ়ত্ব, গভীরতা ও বিশেষত্বের ফলে পত্নী পতির মহাশক্তি—পত্নীর ন্যায় শক্তি পুরুষের আর নাই। বনে গিয়া দময়ন্তী যখন বুঝিয়াছিলেন যে নলের ইচ্ছা তাঁহাকে বনভ্রমণের কষ্ট না দিয়া পিতার গৃহে পাঠাইয়া দেন, তখন বলিয়াছিলেন—

হৃতরাজ্যং হৃতদ্রব্যং বিবস্ত্রং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতম্।
কথমুৎসৃজ্য গচ্ছেয়ং ত্বামহং নির্জ্জনে বনে॥
শ্রান্তস্য তে ক্ষুধার্ত্তস্য চিন্তয়ানস্য তৎসুখম্।
বনে ঘোরে মহারাজ নাশয়িষ্যাম্যহং ক্লমম্॥
ন চ ভার্য্যাসমং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে ভিষজাং মতম্।
ঔষধং সর্ব্বদুঃখেষু সত্যমেতদ্ব্রবীমিতে॥

অর্থাৎ

আমি আপনাকে হৃতরাজ্য, হৃতদ্রব্য, বিবস্ত্র, ক্ষুধিত এবং শ্রান্ত দেখিয়া কি প্রকারে এই নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি? মহারাজ! আপনি যখন ঘোর বনমধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পূর্ব্বসুখ স্মরণপূর্ব্বক কাতর হইবেন, তখন আমি আপনকার শ্রান্তি নিবারণ করিব। মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি যে, বৈদ্যদিগের মতে সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ বিষয়ে ভার্য্যাতুল্য কোন ঔষধ নাই।

বড় সত্য কথা। শোকে দুঃখে বিপদে পুরুষের পত্নীর তুল্য 'ঔষধ' আর নাই। পত্নী যেমন পতিকে রক্ষা করিতে পারেন আর কেহ তেমন পারেন না। পত্নী যথার্থই পতির ঔষধ এবং ঔষধ বলিয়াই পতির শক্তি। কিন্তু ঔষধের ক্রিয়া, ঔষধের উপকারিতা

জীবিতের সম্বন্ধেই হইয়া থাকে, মৃতের সম্বন্ধে হয় না। সাবিত্রী কিন্তু মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করাইয়াছিলেন। মৃতের পুনর্জীবন ঐশীশক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তিতে হয় না, মানবী শক্তির অসাধ্য। ক্রুশে নিহত হইবার পর যীশুখৃষ্ট ঐশীশক্তিতে পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। সাবিত্রী ঐশীশক্তিরূপিণী।

সাবিত্রী মানবী—মানবীর অনির্ব্বচনীয় কোমলতা, নম্রতা, শুশ্রূষাপ্রিয়তা, লজ্জাশীলতাদি তাঁহাতে দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার অশরীরীত্ব, চিন্ময়তা, মনোময়তা, তেজস্বিতা, অমানুষিক শক্তিমত্তাদি দেখিলে মনে হয়, মানব জগতের যে স্তরে তিনি বাস করেন তথায় বুঝি অন্য মানবী আর নাই—সে স্তর বুঝি মানবজগতের ঊর্দ্ধস্থিত দেবাধিকৃত কোন স্তরের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় না, ভারতে বোধ হয় এমন নরনারী নাই। কিন্তু তাঁহার কাছে সকলেই সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত। অমন অশরীরীত্ব, অত শক্তিমত্তা, অত তেজস্বিতা, অত বিশুদ্ধতা, অত মনোময়তা, অত জ্ঞানময়তা, অত পবিত্রতার অধিক সান্নিধ্যে গমন করিতে সকলেই যেন সঙ্কুচিত। সীতা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী—সকলেরই কথা সকলে সর্ব্বদাই

কয়—সভায় কয়, সাহিত্যে কয়, সঙ্গীতে কয়। কিন্তু সভা, সাহিত্য, সঙ্গীত—কোথাও সাবিত্রীর কথা কেহ প্রায় কয় না। তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সকলেই যেন সঙ্কুচিত, কেহই যেন সাহস করে না। তিনি রমণী, কিন্তু তাঁহার মতন রমণী বোধ হয় আর নাই। মহাভারতের মহাকবি স্বয়ং এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রীর পিতা পুত্রকামনা করিয়া যাগ যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রী দেবী যজ্ঞস্থলে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্মা তাঁহাকে পুত্র দিবেন না, একটী তেজস্বিনী কন্যা দিবেন, কিন্তু তিনি যেন সে জন্য অসন্তুষ্ট না হন—

> প্রসাদাচ্চৈব তস্মাত্তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ভুবি।
> কন্যা তেজস্বিনী সৌম্যা ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥
> উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।

"তুমি কোনক্রমে ইহাতে কোন উত্তর করিও না"—তুমি পুত্রকামনা করিয়াছিলে, ব্রহ্মা তোমাকে কন্যা দিলেন—তথাপি তুমি কোন কথা কহিও না। সাবিত্রী দেবী জানিতেন—ব্রহ্মা যে কন্যা দিবেন

তাহার মতন কন্যা মানবকুলে আর কখন হয় নাই, আর কখন হইবেও না।

সাবিত্রী কবি-শাস্ত্রকারের পরম করুণা-ময় সৃষ্টি। সীতা বল, শকুন্তলা বল, দ্রৌপদী বল, দময়ন্তী বল—এমন করুণাময় সৃষ্টি আর কেহই নহেন। যেরূপ করুণা হইতে সাবিত্রীর সৃষ্টি, সেরূপ করুণামূলক, করুণাপূর্ণ কীর্ত্তি হিন্দুর শাস্ত্রে এবং সাহিত্যেও আর নাই। বৈধব্যের ন্যায় বিপদ, বৈধব্যের ন্যায় যন্ত্রণা, বৈধব্যের ন্যায় তুষানল হিন্দু নারীর আর নাই। সমাজ, ধর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল সমস্ত সংরক্ষণার্থ, সমস্তের মঙ্গলবিধানার্থ শাস্ত্রকার বিধবার চিরবৈধব্যের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। কিন্তু চিরবৈধব্যের ব্যবস্থা করিয়া অন্তরে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন—রমণীর নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল। তাই তিনি ভারত-ললনাকে সাবিত্রী দিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ইহাঁরই মতন হইও, ইহাঁকেই তোমার ব্রত স্বরূপ করিও, পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী হইবে, ইহলোকে পতি হারা-ইলেও পরলোকে আর হারাইবে না, নিদারুণ বৈধব্য তোমার অদৃষ্টে আর ঘটিবে না। সাবিত্রী পাইয়া

অবধি হিন্দুরমণী তাঁহার ব্রতপালন করিতেছেন—যে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর ভীষণ রজনীতে সাবিত্রী মহারণ্যে মহাকালের হস্ত হইতে আপন পতিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সাবিত্রীর ন্যায় ব্রতাবলম্বিনী হইয়া বৈধব্য নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া হিন্দুরমণী আজিও সেই কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনীতে সাবিত্রীর আরাধনা করিতেছেন—ধ্রুব বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা, বৈধব্যদুঃখ অদৃষ্টে আর ঘটিবে না। সাবিত্রী হিন্দু রমণীর—দুর্ভাগ্যবতী হিন্দু বিধবার—অশেষ জ্বালা জুড়াইবার স্থান—বড়ই আশা ভরসা শান্তি ও সান্ত্বনার স্থল। মায়ের মতন করুণাময় সৃষ্টি জগতে আর নাই।

পরিশিষ্ট।

মহাভারতের মহাকবির সাবিত্রীর উপাখ্যান অতি ক্ষুদ্র। উহাতে ১১৯ টীর অধিক শ্লোক নাই। কিন্তু সাবিত্রীকে বুঝাইবার জন্য যাহা বলা আবশ্যক মহাকবি ১১৯টী শ্লোকেই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহার জীবনী লেখা যায় তিনি যত বড়ই হউন, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সার কথা তাহা সাবিত্রীর কথার ন্যায় অতি অল্প কথাতেই বলা যাইতে পারে—উচিতও বলা।

মহাকবি সাবিত্রীর জীবনের কেবল তিনটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—সাবিত্রীর জন্ম, সাবিত্রীর বিবাহ এবং সাবিত্রীর মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করণ।

প্রকৃত পক্ষে, ঘটনার মতন ঘটনা, যেরূপ ঘটনায় মানুষের সমস্ত শক্তি, পূর্ণ প্রকৃতি প্রকটিত হয় সেরূপ ঘটনা কোন মানুষেরই জীবনে দুই একটীর অধিক ঘটে না। ইউরোপীয় প্রণালীতে লিখিত জীবনাখ্যায়িকা যেরূপ ঘটনার বিবরণে পরিপূরিত হয় তাহার অধিকাংশ ঘটনা বলিয়া গণ্য হইবারই উপযুক্ত নয়—দুই একটী বাদে তাহার সমস্তই পরিত্যজ্য। ঐরূপ জীবনাখ্যায়িকায় সাহিত্য এবং সমাজ উভয়েরই অনিষ্ট হয়। বড় দুঃখের বিষয় ঐরূপ জীবনাখ্যায়িকাকেই আদর্শ করিয়া এখন বাঙ্গালায় অধিকাংশ জীবনাখ্যায়িকা লিখিত হইতেছে। স্থলবিশেষে বিস্তৃত আখ্যায়িকার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু বড় বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হয়। বঙ্গের জীবনী লেখকদিগের মধ্যে অনেকে তাহা করেন না।

যাহার তাহার জীবনাখ্যায়িকা লিখিতে নাই। পুরাণকারেরা যাহার তাহার জীবনাখ্যায়িকা লিখিতেন না। যাঁহার জীবনে ঘটনার মতন ঘটনা ঘটে,—পুরাণকারের মতে তাঁহার ভিন্ন অপর কাহারো জীবনাখ্যায়িকা লিখিত হওয়া উচিত নয়।

ইউরোপে কিন্তু যাহার তাহার জীবনাখ্যায়িকা লিখিত হয় এবং ইউরোপে হয় বলিয়া এদেশেও হইতেছে। জীবনাখ্যায়িকায় ইউরোপ যেমন প্লাবিত ও প্রপীড়িত বঙ্গও শীঘ্র তেমনি হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভাগ বিশেষে ইহারই মধ্যে আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।
